কবি ও অ-কবি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :
মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

'কবি ও অ-কবি'

আমার বাল্যবন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিংহ

ও বন্ধুপত্নীর হাতে সমর্পণ করলাম—

ব. ভ. ম.

কবি

চলন্ত চলতে গতি আপনিই মন্থর হয়ে এসেছিল, এক সময়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন পুলের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছি, তাইতে [illegible] কে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। সামনে বহুদূর পর্যন্ত [illegible] ডান দিকে ঘুরে গেছে; পেছনে, কলকাতার দিকেও প্রায় অত দূর পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাঁক, এবার বাঁয়ে। দুদিকে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তীর-লগ্ন তরুরাজির নীল রেখা, তারই মাঝে মাঝে যেন মিনা করে বসানো বাড়ি-ঘর-মন্দির-ঘাট-জুটমিল—তার জোড়া চিমনি···

মাঝখান দিয়ে এই বিরাটকায় বিবেকানন্দ ব্রিজ এপার-ওপার চলে গেছে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে তাতে হলদে, গোলাপী, সিঁদুর, বেগুনে—কত রকম যে রং তার হিসাব নেই। রঙের খেলা তীরের গায়ে, জলের ওপর, নৌকার ভরা পালে; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-চূড়াগুলি ঝলমল করছে।

দক্ষিণে-হাওয়াটা এই সবে উঠল, সমস্ত দিনের গুমটের পর। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এসময় এখান দিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে না পড়ে যেন উপায় নেই; একবার দাঁড়িয়ে পড়লে পা তুলে এগুনোও কঠিন।

রেলিঙে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পেছন দিয়ে পুলের

ছু-মুখো ট্রাফিকের স্রোত বয়ে চলেছে, মোটর, লরী, রিক্‌শা ; পায়ে হেঁটেও চলেছে লোকে। অবশ্য খুব হালকা ট্রাফিক ; চারিদিকের নিস্তব্ধতার গায়ে শব্দতরঙ্গ উঠছে মাঝে মাঝে, কখনও স্তিমিত, কখনও মুখর।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি অত খেয়াল নেই ; হঠাৎ দেখি ছুটি যুবক বেশ হন্তদন্ত হয়েই আসতে আসতে আমার থেকে দশ-বারো হাত দূরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু যে কেমন-কেমন ঠেকলই, তাইতেই মুখটা ঘুরিয়ে একটু ভাল করে দেখে নিলাম।

ছুজনেরই বয়স প্রায় সমান বলে মনে হ'ল, পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি। চেহারা লপেটি গোছের, গায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি। এদিকেরটি বাঙালী বলেই মনে হয়, অপরটি কিন্তু অন্য রকম, কাঠামোটা বাঙালীর মত হলেও চুলটা শিখেদের মত করে মাথার মাঝখানে জড়ো করা, দাড়ি গোঁফ অল্পই, কিন্তু অক্ষত। শিখধর্মাবলম্বী ছু-একজন বাঙালী বা বিহারী দেখেছি ; সেইরকম মনে হল। নির্লিপ্ত-ভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও ওরা যে, যে-কারণেই হোক, আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছে এটা বেশ টের পাওয়া যায়। কৌতূহল চেপে চুপ করেই রইলাম আমি।

খানিকক্ষণ গেল, এদিককার যুবকটি সামনের দিকে চেয়েই রেলিঙের মাথায় একটু তবলা বাজিয়ে অপরটিকে ফিসফিস করে কি বলল, তার পর ছুজনেই এগিয়ে এসে প্রায় হাততিনেকের ব্যবধান রেখে দাঁড়াল। চুপ করেই রইলাম, কথাটাও ওরাই আরম্ভ করুক না।

একটু পরে এদিককারটিই একটু নড়েচড়ে যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, আর সময়ক্ষেপ না করে আমার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে একটা

নমস্কার করল, তার পর একটু হেসে প্রশ্ন করল, "গঙ্গার সিঁদুরি দেখছেন স্যার ?"

বললাম, "অবশ্য চোখ বুজে নেই, তবে, বেশ হাওয়াটি দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছি একটু ।"

"এখানে এসে চোখ বুজে দাঁড়াবে, সাধ্যি কি কারুর, ঘর-ছাড়া করে টেনে আনে ।"

আলাপটা দু কথাতেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে—এইভাবে একটু হেসেই সঙ্গীর দিকে ঘুরে চাইল। হয়তো কিছু ইশারাও করল, সেও হাত দুটো তুলে নমস্কার করল আমায় ।

প্রথমটা মনে হল চুপ করেই থাকি, উৎসাহ পেলে কথাবার্তায় বোধ হয় মাত্রা রক্ষা করতে পারবে না। তার পর ভাবলাম, দেখাই যাক না, একটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দাঁড়াল তারও তো হদিস পাওয়া দরকার ।

প্রশ্ন করলাম, "তোমরা আস নাকি রোজ ?"

বলল, "আমরা ! আমরা নাকি মানুষ ? চক্ষু থাকতেও অন্ধ। কি বলিস রে ?"

সঙ্গীটি একটু লজ্জিত ভাবে হাসল ।

এতটা আত্মগ্লানির জন্যই আমি বললাম, "অন্ধ কেন হতে যাবে ? এই তো বললে, ঘরছাড়া করে টেনে আনে, কিছু একটা দেখেছ বলেই তো বললে ।"

"আজ্ঞে, দেখছি বৈকি, দেখব না কেন ?—জল দেখছি, আকাশ দেখছি, মেঘ দেখছি, কিন্তু সব মিলিয়ে যে সিঁদুরিটা হচ্ছে সেটা দেখবার যে চোখ নেই। তার পর যদি-বা এল একটু ভাব মনে—কদাচ-কখনও তো সেটা যে একটু টুকে রাখব সে ক্ষ্যামতা তো নেই ।"

বললাম, "ঢুকে যে রাখতেই হবে তার মানে কি ?"

"কি বলছেন স্যার, সেই তো সমিস্যে ! আর সেই সমিস্যে নিয়েই তো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি চারিদিকে ।"

উৎসাহ-দীপ্ত মুখে আমার দিকে চাইল যেন এতক্ষণে আসল কথাটা এসে পড়েছে। আমিও প্রশ্ন করলাম, "কি রকম ?"

"এই যে দেখছেন, এর নাম গুর্জিৎ সিং···"

"শিখ ?"

"শিখ, সে মাথার চুলে আর হাতে ঐ একটা লোহার বালা আছে, নইলে চার পুরুষ ধরে বাংলায় রয়েছে, এঁদো ডোবার জল শিখের আর কি রেখেছে ওর ? দেখছেনই চেহারা। এখন গুর্জিৎ বিয়ে করতে চায়···"

মুখের দিকে চেয়ে রইল ; বললাম, "করুক না, এ আর এমন সমস্যা কি ?"

"সমিস্যে এইখানে যে শিখের মেয়ে তো পাচ্ছে না, ও এখন আমার এক শালীকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করছে···"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চাইলাম। একটু হেসে বলল, "আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু এ তো আখছারই হচ্ছে স্যার। ওদের জেতের মধ্যে মেয়ে বড় কম তো ; ওরা অত বাছে না, শিখ হল বহুৎ আচ্ছা, নয়ত বাঙালী, কি পশ্চিমা—হলেই হল একটা—সংসার-ধর্ম করতে হবে তো। তবে গুর্জিৎ আবার একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে। দু-একটা বাংলার নমুনা ছাড় না রে বাবুর কাছে, বুঝুন।"

গুরুজিৎ একটু লজ্জিত ভাবে চাইল। আমি বললাম, "থাক, নমুনার দরকার কি ? শিখ বাঙালী হয়ে যায়, বাঙালী শিখ হয়ে যায় এ তো ভালই, আর বিয়ের মধ্যে দিয়েই এটা ঠিকভাবে হবে। তোমার

শালীর সঙ্গে হচ্ছে এ তো উত্তম কাজ। তোমাদের আগে থাকতে জানাশোনা আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"একসঙ্গে কাজ করি আমরা সালকের একটা মোটর-মেরামতের কারখানায়। আমিই তো ওকে কথা দিলাম—কত আর খুঁজে হয়রান হবি? আমার শালীটা ডাগর-ডোগর আছে, দেখতেও অপ্সরা না হোক্, নিতান্ত নিন্দের নয়, বলিস্ তো দু-হাত এক করে দিই। রাজী, শ্বশুর আর শালাকেও রাজী করিয়েছি। আপনি যেমন বললেন—সব উত্তম, সে সব দিক দিয়েই। দিন ঠিক, মেয়ে পছন্দ, গুরজিৎ তিনশ টাকাই দিতে রাজী হয়েছে; সব পাকা, তার পর এখন তরী বুঝি কিনারায় এসে বানচাল হয়।"

"মেয়ে বেঁকে বসেছে?"—ঐখানটায় একটা খট্‌কা লেগেছিল বলে খুব বিস্মিত না হয়েই প্রশ্নটা করলাম।

উত্তর হল—"মেয়ে তো ওকে ভেন্ন বিয়ে করতেই চায় না কাউকে। ওর মাস্‌তুতো বোন আবার শিখের হাতেই পড়েছে কিনা; তবে এক অন্য ফ্যাচাং তুলেছে। মিডিল-পাস-করা মেয়ে কিনা, শহরে তো আজকাল কাউকে মুখ্যু থাকতে দিচ্ছে না, সেই হয়েছে বিপদ।... দেখা না রে চিঠিটা—সঙ্গেই তো আছে।"

"চিঠি!"—এবার সুদে-আসলে বিস্মিত হয়েই বলে উঠতে হল আমায়।

"অনেক দিন থেকে কথা চলছে তো; লেখাপড়া-জানা মেয়ে, চিঠিটা সুরু করে দিয়েছে। গুরজিৎ বাংলা বলে যাবে আপনার-আমার মত, কিন্তু ওদিকে তো অষ্টরম্ভা..."

গুরজিৎ মুখটা একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আরম্ভ করেছি তো শিখতে।"

বেশ পরিষ্কার বাংলাতেই বলল। বললও বোধ হয় আমায় ভাষাটা শোনাবার জন্যই। সঙ্গী বলল, "শিখছে, দ্বিতীয় ভাগ প্রায় শেষ করেও আনল রাত জেগে। কিন্তু ওর যা আবদার তা পুরো করে কি করে বলুন?"

"কি বলে ও?"

"পদ্য চাই বিয়েতে!"—আবদারের বহরটা জানিয়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে চাইল, বলল, "না বিশ্বাস হয় চিঠিটা দেখুন না। আপনি দেখবেন তাতে আর হয়েছেটা কি?"

বললাম, "থাক, চিঠি দেখাতে হবে না। বাঙালীর মেয়ে একটু কবিতার আবদার করবে, এতে আর অবিশ্বাসের কি আছে?"

—"চিঠির উত্তুর—মানে যেটা লভের দিক—আমি একরকম করে লেখাটা একটু বেঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—আবার চেনা হাত তো—গুরুজিৎ উদিকে ক-খ মক্‌শ করে যাচ্ছে—এদিকটা একরকম চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে, কিন্তু কবিতা কোথায় পাই? তাই সকালে উদিকে নটা-দশটা পর্যন্ত, তার পর কারখানা বন্ধ হওয়ার পর দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছি…"

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম, "উদ্দেশ্য?"

"একজন কবি খুঁজে বের করতে হবে তো? এ দায় থেকে উদ্ধার করবে কে?"

"কোথায় কোথায় খোঁজ?"

"খোলা জায়গা—একটু যদি বাগানের মত হল, মাঠের দিকেও চলে যাই দুজনে, দুদিন কলকাতার দুটো পার্কও ঘুরে এলাম। তার পর পুকুর ঘাট, গঙ্গার ঘাট…"

"ঘাট কেন?"

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে হাসল, বলল, "ওনারা সব চান করতে আসে তো—মানে…"

কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "ও !…তা ধর না হয় পেলে খুঁজে, তার পর ? লিখিয়ে নেবে কবিতা ?"

"মাংনাতে কি স্যার ? গুরজিৎ বিয়ের খাতে একটা বাজেট ঠিক করে রেখেছে তার জন্যে…"

একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—"অবিশ্যি, সবাই যে নিতেই চাইবে তা নয়, তবে যদিই চায় নিতে তো গুবজিৎ…কত ঠিক করে রেখেছিস্ রে ?"

গুরজিৎ আবার মুখটা ওঁদিকে ঘুরিয়ে নিল, বলল, "পনেরো, বাড়াতেও পারি।"

"সাইজ দেখে বাড়বে স্যার, ছোঁড়া আর যাই হোক, কেপ্পন নয় !"

চুপ করে রইল। উদ্দেশ্যটা বুঝে আমিও একটু চুপ করেই রইলাম। বেশ লাগছে, দেখাই যাক না একটু। তার পর কেমন একটু মমতা এসে গেল, বললাম, "এক কাজ কর। একটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, পয়সাও লাগবে না এত খোঁজাখুঁজির হুজ্জৎ থেকেও বাঁচবে। একটা বিয়ের কবিতা কোনখান থেকে যোগাড় করে, নামধামগুলো বদলে ছাপিয়ে দাও, না হয় আগে ওর কাছে পাঠিয়েই দাও মঞ্জুর হয়ে আসবার জন্যে, যদি তা-ই চাই।…বিয়ের কবিতা তো পথেঘাটে ছড়ানো রয়েছে আজকাল।"

"চলবে না স্যার। ঐ পথেঘাটে ছড়ানো থেকেই তো কাল হয়েছে। তেত্রিশখানা যোগাড় করে রেখেছে কোথা থেকে কোথা থেকে। যেতেই হবে ধরা পড়ে।"

হেসে ফেলতে হল, হাসতে হাসতে বললাম, "আচ্ছা সেয়ানার

পাল্লায় পড়েছ তো তোমরা! কি সিংজী বাঙালী মেয়ের মোহ এখনও কাটে নি তোমার?"

লজ্জিত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, সঙ্গী বাঁ হাতে একটা ঠেলা দিল, মুখটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, "বের কর্, এই বোকা।"

আগাম ধরিয়ে দিতে চায় নাকি!

ছোক্‌রা কতকটা কুণ্ঠার সঙ্গে বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা গোল পাকানো একসারসাইজের খাতা বের করল, একটা পেন্সিলও; ওর হাতে দিয়ে, মুখটা অল্প ঘুরিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সঙ্গী এ দুটোকে আমার দিকে একটু বাড়িয়ে ধরে বলল, "খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমি শেষকালে গুরোকে বললাম—এ কাজের কথা নয়। চল দুজনে মা-র মন্দিরে ধন্না দিয়ে পড়ি, এতো কে এতো দিচ্ছেন, আর আমাদের একটা কবি জুটিয়ে দিতে পারবেন না? তা একবার মাহাত্ম্যিটা দেখুন স্যার, যেতেও হল না অত দূর, মাঝপথেই জ্বলজ্যান্ত কবি শোভা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!—তোর পয় আছে গুরে।···নিন স্যার ধরুন।···জয় মা! হুজুরের কলমের ডগায় অধিষ্ঠান হও এসে।"

নিবারণের সমিস্যে

ও-রাস্তা দিয়ে এলে-গেলে একবার করে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি, এই মাসখানেক ধরে। এক জোড়া জুতোর ফরমাশ দিয়েছি, আজ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

বললাম, কী গো নিবারণ, আর কত ঘোরাবে ?

নিবারণ ব্যস্ত হয়ে উঠল ; একটা লেডিজ শু হাতে নিয়ে একমনে দেখছিল, একটু যেন লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পাশে সরিয়ে রেখে হাত দুটো ঝেড়ে বলল, এই যে আসুন বাবু, বস্তাজ্ঞে হোক, প্রাতঃপ্রেণাম হই।···টুলটা মুছে দে রে ভাল করে।

রাস্তার ওপরই ছোট্ট একখানি ঘর, চারিদিকে কাটা চামড়া আর যন্ত্রপাতি ছড়ানো, একটা সেলাইয়ের কল। এক পাশে একটি নীচু ছোট্ট চৌকো টুল, একটি বছর দশেকের ছেলে—নিবারণের সম্বন্ধী—একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিচ্ছিল। আমি বললাম, না, বসলে চলবে না, কাজ রয়েছে। বলছিলাম, না পার তো না-হয়—

আজ্ঞে, বসুন একটু, য্যাখন কপালগুণে পায়ের ধুলো পড়লই।··· জুতো তো প্রায় শেষ করে এনেছিনু, তার পর এক সমিস্যেয় পড়ে গেনু যে অকস্মাৎ—

আবার তোমার সমস্যাটা কী ? আমাকেই এক সমস্যায় ফেলে রেখেছ এই তো জানি।

আজ্ঞে, কঠিন সমিস্যে, ওরা তো কত ধানে কত চাল বোঝে না, বলে দিয়েই খালাস ; ওই নেপার মুখে শুনুন না।···তুই আগে যা, যা দিকিন বাবুকে একটা গোলফেলেক সিগ্রেট এনে দে, দে-কাঠির

বাক্সটাও একবার চেয়ে নিবি। ও কী, হাতটা ধুয়ে নিতে হবে না ?··· চলল নাপ্যে !

উঠে বসে প্রশ্ন করলাম, তার পর ?

নিবারণ হাঁটু দুটো দুহাতের বেড়ের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলল, লজ্জিত ভাবেই একটু দ্বিধাভরে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে থেমে বলল, আজ্ঞে, অই আসুক, শুনবেন খন। কথাটা হচ্ছে ওদের না হয় হায়া-লজ্জা বলে জিনিস নেই, ইস্কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু আমি এখন আপনার সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে মুখ খুলি কী করে ?

নিবারণের বাড়ি মার্টিন লাইনে আমার মামার বাড়ির গ্রামে। পরিবারটি মামাদের অনুগত, কাজে কর্মে প্রয়োজনমতো মেয়ে-পুরুষে এসে খেটে দিয়ে যেত, প্রসাদ পেত। মনে পড়ে, বাড়ি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছি কতদিন।

ছেলেবেলার কথা। তার পর মাস দুয়েক হল, পথ চলতে জুতোর তলায় হঠাৎ একটা কাঁটা উঠে অসুবিধায় পড়ায় রাস্তার ধারেই ওর দোকানটা দেখে সেটা ঠুকিয়ে নিতে গিয়ে পরিচয়টা পেলাম। বাঙালীর জুতো-সেলাইয়ের দোকান দেখা যায় না। আমিই জিজ্ঞাসাবাদ করতে টের পেলাম, নিবারণ মামাদের গাঁয়ের দুর্লভের ছেলে। গাঁয়ে রোজগার নেই। মাস পাঁচেক হল শহরে এসে দোকানটি খুলেছে। বাইরে থাকি, মামার বাড়ি যাওয়া-আসা কমে গেছে, আমায় জানবার কথা নয় ওর, পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেই দিন থেকেই খাতির চলছে। এদিক দিয়ে গেলে একটু দাঁড়িয়ে যাই, নিবারণ যায় মাঝে মাঝে গ্রামে, খবর আনে—একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

তার পর জুতোর ফরমাশটা দিলাম।

বেশ লাগে ছেলেটাকে। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স, তেল-চুকচুকে কালো রঙ, মাথায় বাবরি চুল, গলায় এক গোছা কালো সুতোয় একটা তাবিজ ঝোলানো ; দেহে-মনে কোথাও যেন শহরের ছোপটা এখনও ধরে নি।

গল্প করার মধ্যে বেশ একটা সলজ্জ সমীহ ভাব আছে। মাথা নীচু করে জুতো সেলাই করতে করতেই করে গল্প, এক-একবার চোখ তুলে হেসে চায়, কখনও গম্ভীর হয়ে ভ্রূ নাচিয়ে মাথাটা দুলিয়ে দেয়, গল্পের তারতম্য অনুযায়ী।

এক এক সময় গল্প করতে করতেই বেশ প্রাণখোলা হয়ে পড়ে, বেশ খানিকটা যেন অন্তরঙ্গ। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারে না। নেপার জন্যে 'সমিস্যে'র কাহিনীটা তুলে রাখলেও, আরম্ভ করল শেষ পর্যন্ত নিজেই নিবারণ। ও সিগারেট নিয়ে এলে একটু লজ্জিতভাবে বলল, তোর নোতুন দিদিমণির কথা হচ্ছেল, বাবুকে বল্লু, নেপা আসুক, তার কাছেই শুনবেন।

তার পর আমি দেশলাই সিগারেট নিয়ে জ্বালতে যে অল্প অন্তরালটা সৃষ্টি হল, তাতে নিজেই শুরু করে দিল—অন্য একটা জুতো টেনে নিয়ে সেলাই করতে করতে, সমিস্যের গোড়াপত্তন হল প্রথম পক্ষের ইয়েটা···মানে, আপনার দাসী আর কি, সেটা তো মারা গেল—

তাই নাকি!—চকিত হয়ে সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করলাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই আষাঢ় গেলে ঠিক ছ-মাস হবে। দিন চারেকের অসুখ, কবরেজ বদ্যি ডাকতে দিলে না, সাবড়ে গেল।··· এই নেপারই বুন ছেল তো, জিগোন না, যেন ডেড়কোর ওপর কে জ্বলন্ত পিদিমকে এক ফুঁয়ে নিব্যে দিলে। না রে?

নেপা একটু লজ্জিতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল।

সতী-লক্ষ্মী ছেল, যাবার ছেল চলে গেল। এখন বাবা মা কাকী সবাই ধরে বসেছে, আবার একটা বিয়ে কর। আর ইচ্ছেটা ছেল না—একটা করে নে' আসি, তার পর বলা নেই কওয়া নেই, সটকে পড়ুক ওই রকম করে! ওই করি আব কি বসে বসে! তার চেয়ে এ দিব্যি আছি, কারুর তোয়াক্কা নেই।···তার পর ভেবে দেখনু, এই তো রোজগারের জন্যে শহরে চলে এসেছি, বুড়ো-বুড়ীদের দেখে কে সেখানে? বল্লু, তা হলে দেখো এক থাঁদা বোঁচা যা হয়।

একটু মাথাটা তুলে বলল, মানে, যায়ই টেঁসে তো তার জন্যে আর মনে কোনও···মানে, নেপার বুনটা ছিল আবার—

প্রাণটা খুলে আসছে আস্তে আস্তে তবে, শেষ না করে আবার মাথা হেঁট করে জুতোয় মন দিল।

ওর মনের কথাটা আমার স্পষ্ট করে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না ভাবছি, নিবারণ অন্য দিকে গিয়ে পড়ল—

ঠিক করেছে ওরা একটা দেখে শুনে। শুনছি ইদিকে যাহোক-তাহোক করে একরকম আচে, কিন্তু ফ্যাসাদ বাধিয়েছে অন্য দিক দিয়ে।

ফ্যাসাদটা কিসের?—প্রশ্ন করলাম আমি।

ওই যে আইন হয়েচে মেয়েদের পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হবে—সব জেতের! ফ্যাসাদ বেধেছে ওইখেনে। ইস্কুলে পড়ে।

অঘটনটা সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা কী বোঝবার জন্য সেলাই ছেড়ে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইল।

আমি মাঝামাঝি গোছের একটা মন্তব্য প্রকাশ করলাম, তাই তো!

তাইতেই বোধ হয় খানিকটা উৎসাহ পেল নিবারণ, প্রাণটা আর একটু যেন গেল খুলে, বলল, আপনার কাছে লুকুলে তো চলবে নি,

নেপার বুনও আবদার করত, ফরমাশটা করে এটা ওটা চাইত। তার ধরন কিন্তু ছেল অন্যরকম, রুপোর একটা গোট কি গিল্টিসোনার একটা আংটি, দিয়েছিও। এখন ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, এর আবদার তো অত হালকা হবে নি, সেই দাঁড়িয়েছে সমিস্যে।

এ বলে কী ?—ধীরে ধীরে মুখের ধোঁয়াটা ছেড়ে প্রশ্ন করলাম।

ওই নেপাকেই সুদোন না। এও ওর বুনই কিনা ; সে ছেল একেবারে আপুন বুন, মায়ের পেটের, এ হল গিয়ে পিসতুতো বুন। ওকে দিয়ে বলে পাট্যেচে।

নেপার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলে সে লজ্জিতভাবে একটু নীচু করে নিল মুখটা, তারই মধ্যে দৃষ্টি একবার নিবারণের পাশটায় গিয়ে পড়ল।

নিবারণ বলল, ওই তো বন্নু আপনাকে, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, তার আবদার তো ঠানদিদের মতন সেকেলে হবে নি। নেপাকে দিয়ে বলে পাট্যেচে, এক জোড়া জুতো গড়ে দিতে হবে।

সেলাই থেকে দৃষ্টি তুলে আরও প্রত্যাশী হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভাষাটা অনুযোগেরই, তবু কোথায় যেন একটু গর্ব লেগে রয়েছে। চরম অঘটন, এবার কী বলা বেশ জুতসই হবে ভাবছি, নিবারণ আরম্ভ করে দিল—

আপনার জুতোটা নিয়েই পড়েছিনু, ভাবনু, ফরমাশটা দিলেন বাবু, একটু মনের মতন ছাঁট-কাট করে সাপ্লাই দিই, আপারটা কেটে এগিয়েছি খানিকটে, নেপা এসে বলল, ওসব একটু তুলে থুতে হবে নিবারণদা, আর্জেন্টি অডার।···বন্নু আর্জেন্টি অডারটা আবার কার ? বাবুর জুতো সাপ্লাই না দিয়ে আমি এখন কিছুতেই হাত দিচ্চি নে।··· না, কার আর্জেন্টি—এই দেখো বলে একখানা পায়ের মাপ দেওয়া

কাগজ সামনে মেলে ধরলে। বললে, কালীদির ফরমাশ, মেমেদের মতন গোড়ালি উঁচু জুতো চাই, বাজার থেকে কেনা লয়, নিজের হাতে তৈরি, বিলিতী জুতোর মতন লেবেল দেওয়া। ন্যাও, কী করবে করো।···কালীদি হল ওর পিসতুত বুন, যার সঙ্গে বিয়ের কথাটা হচ্চে। বল্লু, হবে নি, বল্ গে তোর কালীদিকে।···নেপা বললে···বল্ না রে, কী বলছেল তোর কালীদি।

নেপা একটু মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

নিবারণই বলে চলল, নেপা বললে, বলেচে—জুতো না পরে বেরুবে নি ঘর ছেড়ে, কপাট আঁকড়ে দাঁইড়ে থাকবে। ইস্কুলে-পড়া মেয়ে তো, বলে যে—গাজুরি বেব কবে নিয়ে যাওয়া—সে সব দিন গেচে। নিন, সমিস্যে নয়? আব একটা সিগ্রেট নে আয় বাবুর জন্যে।

বললাম, থাক্ এখন। একটা দবকারী কাজে বেবিযেছি, আব একদিন এসে গল্পটা শুনতে হবে। তুমি ফিনিশ করে ফেল। তাব পর, খবর ভাল তো?

নিজেই একটু হেসে বললাম, খবর তো উঁচু দরের, কী বল?

লজ্জিতভাবে হেসে, মাথাটা হেঁট করে কাজে মন দিল।

দুদিন পরে একটু অন্যমনস্ক হয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দোকানের তাকে জুতো জোড়াটার ওপর নজর পড়ে গেল। রাঙা আর বাদামী চামড়ার গোড়ালি তোলা জুতো, পালিশ খেয়ে ঝকঝক করছে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, এই তো সমস্যা তোমার মিটিয়ে ফেলেছ নিবারণ!

নিবারণ কাজ থেকে মুখ তুলে ব্যস্তই হয়ে উঠল, যেমন হয়। বসবার আর সিগারেটের ব্যবস্থা করে। আজ একটু নিষ্প্রভ হাসি মুখে করে বলল, আজ্ঞে, মিটল্ আর কোথায় ?

বললাম, কেন, জুতো তো ওই তৈরী দেখছি হয়েছেও দিব্যি, বাঃ !

আরও একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল, বলল, এক সমিস্যে মেটু'তে অন্য এক এসে হাজির। বিয়ের আর দিন নেই তো একেবারে। মনে কন্নু, কাজ কী, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, ওদের বিশ্বাস নেই, একটা র‍্যালা করে দিলেই হল, তার চেয়ে ফ্যাসাদের কাজটা সেরেই ফেলি আগে, তার পর নিশ্চিন্দি হয়ে বাবুর কাজটা ধরব। মনে একটা অশান্তি লেগে থাকলে তো হবে নি ঠিক। চার দিন ধরে একরকম আহার-নিদ্রে ছেড়ে ফিনিশ করে নিয়ে এয়েচি, আজ্ঞে হ্যাঁ, আহার-নিদ্রে ছেড়েই বইকি, আপনারটার দিকে মনটা পড়ে রয়েছে তো। ফিনিশ করে এনেচি, আজ নেপা আর এক খবর নে এল গাঁ থেকে।··শুনিয়ে দে না রে বাবুকে।

নেপা সিগারেট দেশলাই হাতে তুলে দিয়ে মুখ নীচু করে একটু হেসে বলল, ও বিয়ে হবে নি। অন্য মেয়ে দেখচে।

কেন, কী হল আবার ?—রোমান্সটা বেশ জমে আসছিল, একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম আমি।

চামড়া কাটছিল, বাটালিতে একটা চাপ দিয়ে মুখটা একটু বিকৃত করে নিবারণ বলল, বেশী রস হলে যা হয় তাই হয়েচে। হবে কি ? ইস্কুলে-পড়া মেয়ে তো।···একটা আবদার করে পাট্যেছেল, তা তার হচ্ছে ব্যবস্তা, চুপ করে বসে দেখ্। তা নয়, ঢাক পিটিয়ে দিয়েচে, বরকে দিয়ে মেমেদের মতন জুতো গড়াচ্চে, পায়ে চাপ্যে, শ্বশুল-বাড়ি যাবে, না হয় যাবে না। স্কুলের সঙ্গীরা আচে তো, তাদের কাচে

বাহাত্বরিটে নিতে হবে নি ? এক কান থেকে পাঁচ কান, পাঁচ কান থেকে দশ কান—ক্রেমে সমস্ত গাঁ এখন জেনে গেচে এই—এই কাহিনী। বাবা বেঁকে বসেচে, ও মেয়ে ঘরে আনবু নি।

বললাম, এঃ, এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেল কেন দুর্লভ ? জুতো না দিলেই হত। সত্যি বিয়ের কনে তো আর কপাট ঝাপ্‌টে ধরত না !

ভেতরকার কথাটা না জানলে তো আপনি বুঝবেন নি, ব্যাপারখানা আসলে কী। মা যে বাবার মাথাটা চিব্যে খেয়ে বেখেছে উদিকে ; রোজ সকালে পাদোদক খেয়ে তার পর কিচু মুখে দেবে তো ! তা মা সেকেলে মানুষ করে এয়েচে বলে তোমার একেলে পুত্র-বউও তাই করবে ? কন না আপনি।

তা কখনও করে ? এঃ, এমন ভুলটা দুর্লভ করতে গেল কেন ?

সহানুভূতি পেয়ে ভাবটা বদলে আসছে নিবাবণের। বলল, তা করুক। কিন্তু আমিও বাপকা-বেটা, এসা মতলব বের করেচি, এক ঢিলে দুটো পাখিই না ঘায়েল করি তো আমার নামে একটা কুকুর পুষে রাখবেন।

মতলবটা কী শুনতে পাই না ?

বিয়ে যদি করি তো ওই মেয়েকে—ইস্কুলে-পড়া হোক, মেমসাহেবী চাল দেখাক, কুচ পরোয়া নেহি।

রোমান্স ফিরে আসছে দেখে প্রশ্ন করলাম, মেয়েটি বড় পছন্দ ?

তিনটে গাঁ ছাড়িয়ে বাড়ি, মেয়ে চোখেই দেখি নি তার পছন্দ আর অপছন্দ। ইদিকে ঠিক করেচি ওকেও জুতো সাপ্লাই দোব না, দেখি কী করে !

গোলমেলে ঠেকায় ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চাইলাম। নিবারণ বলল, বুঝলেন না ছকটা ?

বললাম, যতদূর বুঝেছি, বিয়েটা তো ভেস্তেই যাবে।

যাক, তাই তো চাই। ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনী নিয়ে কাটাবার শখ হয়েচে, একেবারে মূলে হাবাত। কিন্তু তা হবে নি, এই বলে দিনু, নিকে রাখুন। জুতো তো আর যাচ্ছে না, ছেলে অন্য বিয়ে করবে না, ওর বাপের সঙ্গে যোগসাজস করে ঠিক ওইখানেই ঠিক করবে বিয়ে। তার পর সামলাও ঠেলা, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, য্যাখন বলচে, একটা হুজ্জৎ লাগাবেই কনে বিদেয়ের সময়; পাড়ায় মর্যোদা আচে বুড়োর, তা নাহক মাথাটা হেঁট হল তো?··· তার পর এনারও কেমন আবদার, জুতো পায়ে না দিয়ে বেরুব নি, তা বিয়ে করা কনে, চল্ ছুঁড়ী বলে য্যাখন হিড়হিড় করে টেনে নে যাবে, পারবি রুখতে তুই?

রাগ, আক্রোশ, অভিমান সবগুলো একসঙ্গে জুটেছে; এদিকে শত দোষ থাকলেও ইস্কুলে-পড়া মেয়ের আকর্ষণটা যে খুবই প্রবল সেটা বুঝতেও দেরি হয় না। এখন আমার মনের ভাবটা যাই হোক।

অথচ তিন জনের তিন দিকে কেমন উলটো টান, বিয়েটা যে ভেস্তে যাবেই সেটা বেশ স্পষ্ট। মেয়েটা ছেলেমানুষ, শেষ অবধি যে কপাট জড়িয়ে ধরবেই এমন কথা নয়, তবে ভুলভকে বেশ চটিয়েছে, নিবারণ যাই বলুক, আমি তাকে যতটা জানি, মেয়ে এরকম হালফ্যাশানের যখন টের পেয়েছে, কোন মতেই ঘরে আনতে চাইবে না।

মনটা দমে গেছে। আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে টানতে সমস্যাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এক রাশ বকে গিয়ে বোধ হয় মনটা হালকা হয়েছে। নিবারণ সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে মুখ তুলে বলল, মরুক গে, যা হবার তাই হবে, এখন সমিস্যে হয়েছে, জুতো জোড়াটা নিয়ে করি কী?

কেন, বিক্রী করে দেবে। যেমন দেখছি—

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। নিতান্তই যা সহজ উপায়, সেই হিসেবে মুখ দিয়ে খানিকটা বেরিয়ে গিয়ে যেন নিজের গালে নিজের থাপ্পড়ের মত বাজল।

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা নীচু করে সেলাইয়ে মন দিয়েছিল। নিতান্ত ম্লান কণ্ঠে, মুখটা নীচু করেই বলল, হ্যাঁ, তাই তো করব, মেহনত হয়েছে তো।···নিয়ে গিয়ে দেখা না বাড়ি বাড়ি নেপা—যা দেয়।

মুখটা তুলেছে, আমার বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, কী কবে বের করতে পারলাম কথাটা? কী করে সামলানো যায়?

যতটুকু বুদ্ধি সগু সগু জুটল খাটিয়ে, যতটুকু বাঁচিয়ে নেওয়া যায় এ অবস্থায় তার চেষ্টা করে, তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সে কি হয়? এ জুতো অত খেটে করেছ, যার-তার হাতে কি বেচা যায়? তবে নেহাত যদি বেচবেই ঠিক করেছ তো এক কাজ করবে না হয়—

বলুন।—মুখ তুলে চাইল নিবারণ।

দেখি জুতো জোড়াটা!

ওর হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, তোমার হাত হয়েছে ভাল, কদিনই বা শহরে এসে বসেছ। আমার জোড়াটাও একটু এই রকম মন লাগিয়ে করতে হবে বাপু, করবে তো?

ওর মনটা একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাই। ফল হল, প্রশংসার মুখটা আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বলল, আজ্ঞে, তা করবু নি? কী যে বলেন! আপনার জুতো। এ তো হালফ্যাশান করে এক রকম দায়ে সারা করে ফিনিশ করে দিয়েছি।

তা হলেও সরেস মাল হয়েছে। তাই বলছিলুম, যার-তার হাতে বেচতে যাবে কেন? আমার একটি নাতনী পাদরীদের স্কুলে পড়ে,

দারুন শৌখিন, গোড়ালিটা আরও না তুলে দিতে হয়, তা দাও তো তার জন্যেই না হয় নিয়ে যাই।···হ্যাঁ, এই মাপ, সেদিকে ঠিক আছে।

সাময়িকভাবে ওদিকটা ভুলে গেছে নিবারণ, এক গাল হেসে বলল, আজ্ঞে, সে তো আমার সৈভাগ্যি।

তা হলে দাও একটু কাগজে মুড়ে। দাম কী দিই?

দেন যা হয় একটা।

তবু?

গোটা-আষ্টেক দেবেন। না, বেশী হল?

নাঃ, শহরে এসে বসা তোমার ভুল হয়েছে বাপু।—একটু ধমকের সুরেই বললাম, টাকা চোদ্দর কমে কোন কারবারী এ জুতো ছাড়তে পারে? তোমায় অত আর দিলুম না, এই বারোটা টাকা ধর।···উঠি, দেরী হয়ে গেল।

কথাটা আচমকাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ভালই হল, জুতো জোড়াটাই তো আপাততঃ 'সমিস্যে' হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিবারণের. দেখত আর আপসাত; চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

সরে গিয়ে কিন্তু দেখছি আমার সমস্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। কথাটা সামলাতে নাতনীর নামে কিনে তো নিলাম, তার কিন্তু ও-জুতো পায়ে দিতে এখনও অন্ততঃ পাঁচ বছর দেরি। সেও না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করা যেত একটা, কিন্তু সমস্যাটা অন্য দিক দিয়ে ঘোরালো হয়ে উঠল।

ঘরে চোখের সামনেই রাখা জুতো জোড়াটা নজরে পড়ে আর মনটা হু-হু করে ওঠে।···আচ্ছা, বিয়েটা হবে না? হলেও ওই রকম একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে শুভকাজে? তাও না হয় নাই হল, কনে-বউ,

অতটা সাহস নিশ্চয় হবে না, কিন্তু ওই রকম মনমরা হয়ে প্রথম শ্বশুর-বাড়ি আসবে—ছেলেমানুষ !

ক্রমে এই যেন আমার জপমালা হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে-ফিরে মনটা ওইতেই ফিরে আসে, আহা, হয়তো পায়েও দিত না মেয়েটা, তোলাই থাকত বাক্সে, তবু বিয়ের দিনের একটা সাধ মিটত তো।···মনটা এক-একবার ছাঁত করেও উঠছে—যদি সত্যিই বিয়েটাই ভেঙে যায় ? ছেলেটা বড় ভাল—মনে মনে একটি স্কুলে-পড়া কিশোরীকে পাশে দাঁড় করিয়ে বেশ ভাল লাগছিল আমার। স্মিত নত দৃষ্টি—আবদার শোনে এমন মনের মত বর পেয়েছে।···এখন দূরে দূরে দুটি বিরহক্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন মুখ···

বড় অশান্তিতে পড়ে গেলাম।

দিন চারেক এইভাবে কাটার পর হঠাৎ একটা নূতন আইডিয়া এল মাথায়। নিজে একটু এর মধ্যে পড়ে দেখলে হয় না ? অনেক দিন যাইও নি মামার বাড়ি। বেশ একটি প্ল্যান মাথায় গজিয়ে উঠতে লাগল। তাড়াতাড়ি একবার নিবারণের দোকানের দিকে গেলাম। দেখি তালা বন্ধ। বিয়ে করতেই চলে গেল নাকি নিবারণ বুকটা ধক্ করে উঠল—কি রকম কি হবে ? সেই মেয়েই, না অন্য একটাই ঠিক হল ?

পাশের বাড়ির রকের সিঁড়িতে একটি যুবক হেলান দিয়ে দাঁতে কুটো কাটছিল, জিজ্ঞেস করতে বলল, কাল চলে গেছে তালা এঁটে।

মনের আগ্রহেই প্রশ্ন করে বসলাম, বিয়ের জন্যে গেছে কি ?

একটু হেসে বলল, কী করে বলি বলুন ? আমায় তো নেমন্তন্নপত্র দেয় নি।

আর কাউকে জিজ্ঞেস না করে বাসায় ফিরে এলাম। বেরিয়েই পড়ি কপাল ঠুকে, যা হচ্ছে সামনে গিয়েই দেখি।

একটু বাধা পড়ে গিয়ে দিন চারেক দেরি হয়ে গেল আমার।

অনেক দিন পরে মামার বাড়ি গেছি, প্রশ্নে-উত্তরে নানা কথা এসে পড়ছে, তার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে আমি নিবারণের বিয়ের কথাই ভাবছি, তারপর এক সময় কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন করে বসলাম, মুচিপাড়ার সেই দুর্লভ—বেঁচে আছে মামীমা?—সেই যে আমাদের বাড়িতে আসত?

বেঁচে থাকবে না কেন? ও মা, সে যে বিয়ে দিলে তার ছেলের সেদিন—

দিয়ে দিলে বিয়ে?···মেয়েটা—

মুন্সীর হাটে মেয়ের বাড়ি। আমাদের সে দেখাতে নিয়ে এল বেটা-বউ···দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি—শুনলুম ইস্কুলে পড়ত, তা দেখলুমও সাজগোজে বেশ একটু চেকনাই—

জুতো পরে এসেছিল?···মানে—

আবার মনের উদ্বেগে বোকার মত বেরিয়ে গেল কথাটা। মামাতো বোন চোখ কপালে তুলে বলল, জুতো পরে আসবে!

মামীমা সহজভাবেই নিলেন। ওকে বললেন, তুই আজই এসেছিস, জানিস না।···হ্যাঁ, উঠেছিল একটা ঘোঁট—দুর্লভের বেটা-বউ নাকি জুতো পরে আসবে বলেছে। তা—তা কখনও পারে বাবা? এল দিব্যি দু' পায়ে আলতা পরা, সাজগোজে একটু ছিমছাম—ওরাও তো হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে—

মনটা হালকা হয়েও এক জায়গায় একটু ভারী হয়ে রয়েছে। কী ভাবে নিলে দুর্লভ পুত্রবধুকে, কী ভাবে রয়েছে ইস্কুলে-পড়া মেয়ে ?

সন্ধ্যায় একটু বেশ গা-ঢাকা হয়ে এলে আস্তে আস্তে দুর্লভের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বাইরে একটা কাঁচা দেয়ালের দালান, একটু ভাল করে গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া, নীচেটা শান। চালের বাতা থেকে একটা লালঠেন ঝুলছে—নতুন, নিশ্চয় বিয়ে উপলক্ষে কেনা। দালানেব মধ্যে একটা চৌকি, ওপরে মাদুর পাতা, দুটো মোড়াও বয়েছে। আগেকাব চেয়ে একটু শ্রী হয়েছে দুর্লভেব বাড়ির।

লোকজন বাইরে কেউ নেই। ডাক দিলাম, দুর্লভ আছ ?

উত্তর এল, কে ? বোস, এনু।

অনেক পরিবর্তন হযেছে দুর্লভেব, অন্য জায়গায এলে বোধ হয চিনতে পারতাম না। বললাম, চিনতে পাব আমায ? এই আলোর কাছে এসে দেখ দিকিন।

বেশ কাছেই মুখ নিয়ে এল। ঠাওব কবে বলল, কই, চিনতে তো পারলুম নি বাবুকে। তা কি কদ্দেশ্য নিয়ে পাযেব ধুলো পড়ল ? বস্তাজ্জে হোক।

বললাম, আমি হচ্ছি বাঁড়ুজ্জেদের ভাগনে, ছেলেবেলায কত এসেছি, খেয়েও গেছি বাড়িতে, মনে আছে ?

বাঁড়ুজ্জে মশাইদের ভাগনে!—একটু চোখ পিটপিটিয়ে ভাবল দুর্লভ, তার পরেই উল্লসিত হয়ে উঠল।

ও, দাঁড়ান···শৈল ঠাকুব—শৈল ঠাকুর! তা হবেন বইকি, এত বড়টি তো হবেন। কী সৈভাগ্যি! বস্তাজ্জে হোক, বস্তাজ্জে হোক।

আনন্দে কী করবে যেন ভেবে উঠতে পারছে না। একটা মোড়া তুলে নিয়ে এসে পাশে রেখে বলল, বসুন আগে, কী সৈভাগ্যি আজ আমার! বেটার এই নোতুন বিয়ে দিনু—তা দেখুন, আপনাদের পায়ের আশীর্বাদে কী পয়মন্ত বউ এনেছি ঘরে—

মোড়াটায় বসতে বসতে বললাম, মামার বাড়ি এসে সেই কথাই শুনে তো তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম। বেটার বিয়ে দিলে, তা লুচি সন্দেশ কই আমার?

মোড়া বা চৌকিতে কোন মতেই বসল না তুর্লভ। ও সামনে, হাত তুয়েক দূরে নীচেয় বসে। আমি মোড়ার উপর। গল্প হতে লাগল আমাদের একেবারে সেই ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে। বিয়ে-বাড়িতে লোক-সমাগম হয়েছে—মেয়ে বোন, তাদের ছেলেমেয়ে। ডেকে ডেকে পরিচয় করে দিতে লাগল। বাড়ির ভেতর একটা পেট্রোম্যাক্স লাইট জ্বলছিল, সেটাও বাইরে আনিয়ে নিল আমার খাতিরে, বলল, শৈল ঠাকুর এয়েছেন আলো করে—কী সৈভাগ্যি আমার—বড় আলোটা সদরে এনেই ট্যাঙো দে।

খানিকটা রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে বললাম, এখন তা হলে উঠি তুর্লভ। কই, কেমন পয়মন্ত বউ করেছ, দেখালে না তো?

সি কী কথা! দেখাব নি? বলে, ছিচরণের দাসী আপনার। ঠিক করেছিনু নাইয়ে ধুয়ে সকালে বামুনবাড়িতে পাট্যে দোব, তুজনাকে একসঙ্গে—নেপাটা আবার কোথায় বেইরেছে কিনা—

বললাম, তা নয় দিও। এখন একবারটি দেখি, একটা কী যে বলে, ইয়ে লেগে রয়েছে তো।

এই আনি তা হলে, নিজেই নেসচি।

কত যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে ভেতরে চলে গেল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি ভিড় হয়েছে মাঝারিগোছের। গল্প করছি, মেয়েটি একটু আড়ষ্ট হয়ে দুর্লভের সঙ্গে এসে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে আমায় প্রণাম করে দাঁড়াল। দিব্যি ফুটফুটেটিই। বললাম, সরে এসো তো মা।

আর একবার বলতে হল, পাড়াগাঁয়ে এখনও ওসব বালাই তো একেবারে উঠে যায় নি। এগিয়ে এলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, আলোয়ানের মধ্যে থেকে একটা পুলিন্দা বের করে বললাম, ধর এটি, তোমার শাড়ি ব্লাউজ আছে।

দ্বিতীয় পুলিন্দাটি বের করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, একটা তো রিস্‌ক্‌ই নিচ্ছি, দুর্লভ কী ভাবে নেবে কে জানে! তারপর বের করে নিলাম, বললাম, বাজার করতে গিয়ে এক জোড়া ভাল জুতো বড় নজরে পড়ে গেল দুর্লভ, বেটির জন্যে নিয়েই নিলুম, আজকাল তো হয়েছে এ সব।···কি বল?

মোড়কটা একটু খুলেই ধরলাম।

একটু হকচকিয়ে গেল বুড়ো, ক্ষণিকের জন্য মাথার মধ্যে কী একটা যেন খেলে গেল। তার পর মুখে একটু যেন কৌতুকের হাসি ফুটল, বলল, তা এনেচেন যখন পছন্দ করে, দেবেন বইকি, এতে আমি কী বলব, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে আপনার ওপর কথা কইবে? তা যদি বললেন তো বেটীর একটা সাদও ছেল। তবে, বেমানান হয়তো আমাদের ঘরে। তা এবার তো দিব্যি মানানসই হয়েই এল ঘরে, বামুনের আশীর্বাদ—

কাগজটা ফেলে দিয়ে জুতো দুটো সামনে বাড়িয়ে বললাম, তা হলে একবার পায়ে দিয়ে দেখো তো মা, আন্দাজে কেনা, খুঁতখুঁতু-নিটা যাবে।

আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দুর্লভই তাগাদা দিল, দে, পায়ে দিয়ে গড় কর আর একবার। কত ভাগ্যি দেখছিস নে!

নিবারণ হঠাৎ এসে পড়ল, ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে একেবারেই দালানে উঠে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার নজর পড়ে গেল জুতোর ভেতর রাঙা চামড়ায় ওর নাম লেখা লেবেলটায়, কড়া আলোয় সোনার জলের লেখাটা চিকচিক করছে। বউ তখন আধা-ঘোমটার মধ্যে মুখটা নীচু করে বাঁ পাটা গলাতে যাচ্ছে জুতোর মধ্যে।

বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মদর্শন

মেয়ে নিতান্ত 'আহা-মরি' না হলেও একেবারেই যে বাতিল করে দেওয়ার মত এমনও নয়। তবু কারুরই আর পছন্দ হয়ে উঠছে না শেষ পর্যন্ত, একবার করে সবাই দেখে এলেন।

ছেলের বাপ-খুড়ো নেই, অভিভাবক ঠাকুরদাদা। তিনি গিয়ে সবার আগে দেখে এক কথাতেই নাকচ করে দিলেন, একটু নৈরাশ্যের হাসি হেসে বললেন, "একেবারেই অচল।"

ক্রমাগতই এই হচ্ছে, বিয়ে তো দেওয়া চাই, অনুপমের ছোট বোন নিরুপমা বলল, "তুমি নাতির জন্যে একেবারে ডানা-কাটা পরী চাও দাদু, আমরা তো রাজা-রাজড়ার ঘরে খুঁজতে যেতে পারব না, কি করে হয় বল?"

সনাতন গড়গড়া টানতে টানতে বললেন, "একেবারেই অচল যে। তোমরাই না হয় দেখে এসো।"

"বেশ, সেই কথাই থাক। আমাদের পছন্দ হলে হবে তো? ...তোমার মতন সন্দেশ খেয়ে এসে বেইমানি করতে পারব না, তা কিন্তু বলে যাচ্ছি।"

"বেশ তো, যা না ; দাদা সন্দেশ খাওয়াচ্ছে না বলে তার ওপরও তো বেইমানি করবি নে।"

"খাবই সন্দেশ ; শুনেছি মেয়ে তত খারাপ নয়।"

পাড়ার একজন বর্ষীয়সীকে নিয়ে দেখে এল মেয়ে।

তিনজনেই এসে ওপরের বারান্দায় বসল, সনাতন তামাক খাচ্ছিলেন।

"হ্যাঁ দাদু, মন্দ কি এমন? নাক মুখ চোখ সবই একরকম আছে, গড়ন ভালই, রংও...... "

"ও ন'কে চলবে?"

—সটকাটা আবার মুখে দিয়ে গম্ভীর ভাবে টানতে লাগলেন। একটু যে নিস্তব্ধতা গেল তাতে তিনজনের মধ্যেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি হল। ওষুধ ধরেছে দেখে সটকাটা আবার মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন সনাতন।

"চলত। ·কিন্তু মুখটা একটু বেশি গোল নয়?..."

নিরুপমা বলল, "ভালই তো ; বেশ ঘোরালো, চাঁদপানা..."

"একশবার স্বীকার করছি। ষষ্ঠীরও নয়, একাদশীরও নয়, পূর্ণিমার চাঁদ। সেই জন্যে ও নাক একটু বেশি খাঁদা মনে হয় না?"

পাড়ার লোককেই সাক্ষী মানলেন, "ফুল-বৌমা কি বলেন জিজ্ঞেস কর না।"

বর্ষীয়সী আধা-ঘোমটার মধ্যে দিয়ে একটু নিম্ন কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, গোল মুখে একটু টানা নাকেই যেন খোলতাই..."

নিরুপমা বাধা দিয়ে বলল, "না দাদু, ওটুকুর জন্যে আর অমত কোর না…"

"ওটুকুই নয়। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে …..”

"আর খুঁটিয়ে দেখতে হবে না তোমায়। …তুমি যেন কী দাদু! নিজে সাত তাড়াতাড়ি ম্যাট্রিক পাশ করেই বিয়ে করেছিলেন, এদিকে দাদা কলেজ ছাড়তে চলল, এখনও পছন্দই হচ্ছে ·· ”

মা আর বর্ষীয়সী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নাতনী নিয়ে হয়তো একটা মিষ্টি ঠাট্টা মুখে এসেছিল, উচ্চারণ করতে না পেরে সনাতন শুধু একটা মিষ্টি হাসি ঠোঁটে করে তামাক খেয়ে যেতে লাগলেন।

নিরুপমা বলল, "বেশ, তাহলে এক কাজ কর বরং, দাদার হাতেই ছেড়ে দাও আর সবই তো ভাল – কুটুম সাক্ষাৎ…"

"কেড়ে রেখেছি আমি?"

"ঠাট্টা নয়। দাদা দেখে আসুক। পছন্দ হয়, করুক বিয়ে, খাঁদা কুচ্ছিত নিয়ে ভুগুক চিরজন্মটা …"

উঠে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "দাদার ইচ্ছে আছে দাদু, বলছি আমি। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল, সরে গেল এই।"

অনুপম দেখে এসে বোনের মারফতই জানাল খুব অপছন্দ নয় তার। বিয়ের এখন ইচ্ছে নেই মোটেই, তবে ওঁরা চান তো দেখতে পারেন ওখানে।

সনাতন বললেন, "তাই হবে তাহলে। তবে ডেকে আন্ একবার আমার সামনে। একটা কথা বলেছি, নেহাৎ হারব নাতির কাছে, একটা ফয়সলা অন্তত হয়ে যাক।"

এলে প্রশ্ন করলেন, "ওনাকে চলে যাবে তোর বলছিস? তাহলে?"

"চলে যাওয়া-যাওয়ি মানে···"—একটু কুণ্ঠিত ভাবেই আরম্ভ করল অনুপম—"বলছিলুম ওকে—আব সব যদি ঠিক আছে মনে করিস তোরা···মানে, মুখটা তো অত গোল থাকবে না, গাল ঝরে গেলে নাকটা তখন আবার ··"

"চোয়াল দুটো লক্ষ্য করেছিলি? ·একটু ভারী নয়?",

বেশ একটু থতমত খেয়েই মুখ তুলে চাইল অনুপম। ওষুধ ধরেছে দেখে আবাব মুখ থেকে সটকাটা সরিয়ে নিলেন সনাতন, একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, "না হয় আধুনিকের চোখ নেই আমার এখন, এক সময় তো সেই চোখেই দেখেছি। গাল ঝরে গিয়ে যখন দুটো চোয়ালের হাড় বেবিয়ে আসবে তখন···কান দুটো কি রকম একটু দাঁডা-দাঁড়া তাও বোধ হয় অত লক্ষ্য করিস নি···"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে· আতঙ্ক ভবে আসছিল, অনুপম বলল, "থাক্ তাহলে ওখানে।"

একটু চিন্তিত ভাবে আস্তে আস্তে চলে গেল। নিরুপমা মুখটা ভার করে একটু আক্রোশ বসেই বলল, "কী যে পেয়েছ রাঙা-ঠাকুমার মধ্যে দাদু, চাও না যে একটি টুকটুকে নাৎবৌ এসে পাশে দাঁড়াক। আমিও ছেড়ে দিলুম এবার।"

একেবারে উলটো বলল। একটি টুকটুকে, নিখুঁত নাৎবৌই চান সনাতন এবং এ-চাওয়ার সঙ্গে স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর খানিকটা·সম্বন্ধও আছে। সুরূপা বলে কোন কালে খ্যাতি ছিল না বিন্ধ্যবাসিনীর। দাঁত, ঠোঁট, কপাল, চোখ—যা নিয়ে রূপ তা বরাবরই প্রতিকূল

সমালোচনাই পেয়ে এসেছে। শুধু চামড়াটা একটু কটা, তারই ওপর নির্ভর করে সনাতনের পিতা বধূ করে এনেছিলেন তাঁকে।

এই রকম রূপ, তার ওপর গৃহিণী হিসাবে যত গুণই থাক, অত্যন্ত মুখরা স্ত্রীলোক।

শৌখিন ভাল মানুষের মুখরা স্ত্রী হওয়া ভাল। শখের দিকটা বাইরে-বাইরে বজায় থাকলেও ভেতরে যায় শুকিয়ে। সনাতন এখনও চুনট করা কালাপেড়ে ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রূপ নিয়ে যে একটা খুঁৎখুঁতুনি এটা অনেক দিনই ভোঁতা হয়ে গেছে, বিন্ধ্যবাসিনীর মুখরতার জন্য। খুব যে মন্দ কাটল জীবনটা এমনও নয়। সদাই ভয়ে ভয়ে থেকে বেশ এক ধরনের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে তার সঙ্গে; জীবনকে নিরুপায় ভাবে গ্রহণ করবার, আত্ম-সমর্পণের মধ্যে দিয়ে একটি হাস্য মণ্ডিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকবার ক্ষমতা অর্জন করে ভাল ভাবেই কাটিয়ে দিলেন জীবনটা। ওদিকে বিন্ধ্যবাসিনী যে মনে করেন চুনট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি তাঁরই জন্যে— এতে তাঁর মেজাজের পারাটা মাঝে মাঝে নামিয়ে এনে সব দিক দিয়ে সাহায্যই করে। বেশ চলে এসেছে একরকম।

কিন্তু সারা জীবন ধরে যা থেকে বঞ্চিত রইলাম, সুযোগ পেলে সেটা অত্যুগ্র হয়েই দেয় দেখা। নিজের যা হল না, জীবনের সায়াহ্নে নাতিকে অবলম্বন করে সেই সাধটি নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে চায়। একটি একেবারে নিখুঁত সুন্দরী নাৎবৌ আসুক এবার। ঘোরাফেরা করুক চারিদিকে। রূপের আলোয় জীবনটা একবার নূতন করে বিকশিত হয়ে উঠুক রহস্যে হাস্যে পরিহাসে।

নিখুঁত, তার সঙ্গে শান্ত, নতদৃষ্টি।

সনাতনের মনের মত হয়ে উঠছে না।

বিন্ধ্যবাসিনী দলপেয়ে মাসখানেক হল তীর্থ পর্যটনে গেছেন। বাড়ি থেকে একাই গেছেন ; মাঝে মাঝে যান। তীর্থ-পর্যটনের শখটা বেশি করে সনাতনেরই হওয়া উচিত, কিন্তু কি রহস্যে বলা যায় না, মোটেই নেই। হয়তো পত্নী-বিরহিত বাড়িটাই তাঁর তাবৎ দিনের জন্য তীর্থ হয়ে ওঠে। একটু নিশ্চিন্ত মনেই নাৎবৌয়ের সন্ধানে লেগে যান।

একদিন একটা টেলিগ্রাম এল বিন্ধ্যবাসিনী ফিরে আসছেন।

নিরুপমার মেয়েটি বড় চোখে লেগেছে, এরই প্রতীক্ষায় ছিল, ফিরে এলে বিন্ধ্যবাসিনীকে ধরে বসল—একবার দেখে আসতে হবে।

একটু ধাক্কা খেতে হল। সাধারণ নিয়মটা হচ্ছে—বিন্ধ্যবাসিনী যে পথে যাবেন সনাতনের সেই পথ হলেও, সনাতন নিজের হতে কোনও পথ ধরলে, বিন্ধ্যবাসিনী ঠিক তার উলটো দিকে পা বাড়াবেন। সনাতন যখন বাতিল করেছেন, বিন্ধ্যবাসিনীকে দলে টানা সহজ হবে, এই ভেবেই তাঁর কাছে এগুলো, কিন্তু হয়তো সদ্য তীর্থ থেকে ফেরার জন্যই তিনি একেবারে উলটে গেলেন, বললেন, "সে কি লো, বলিস কি ! উনি একটা মত দিয়েছেন, আর আমি এসে সেটা উল্টে দোব একেবারে ! চার পো কলি তো হয় নি এখনও।"

স্বামীর কাছে অনুযোগও করলেন, অভিমতটা জানিয়ে বললেন, "বলে কি তোমার নাতনী ! বুড়ো বয়সে আমায়ও ওদের মত 'আধুনিকা' ঠাওরালে নাকি ?—পরিবার চললেন আগে আগে, স্বামী চললেন পেছনে !"

পঞ্চাশ বৎসরের সারা দাম্পত্যজীবনে এ ধরনের অমৃতবর্ষণ হয় নি সনাতনের কর্মে। একটু জিদ করেই বললেন, "যাও, দেখে এসো, আবদার ধরেছে ছেলেমানুষ।...পছন্দ হয়, ঠিক করেই আসবে, তোমার পছন্দ ভুল হবে না তো।"

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্ময়ে গালে আঙুল চারটে চেপে ধরলেন, বললেন, "শোন কথা—সব শেয়ালের এক রা! ইনি আবার বলেন ঠিক করেই এসো!"

নিরুপমার দিকে চেয়ে বললেন, "নিয়ে যাচ্ছ, চল নিয়ে, কিন্তু যা হবার তা আগে থাকতেই বলে রাখছি বাপু—যা বেরিয়েছে এক মুখ থেকে, অন্য মুখে এসে তা ওলটাবে না—বেম্ভা-বিষ্টু-মহেশ্বর এলেও না।

নিরুপমা নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, "বেশ, চলই তো তুমি।"

তিনবার সাজ-গোজ করিয়ে দেখা হয়েছে, এবার কি ভেবে নিরুপমা আর আগে থাকতে কিছু জানাল না। একটা রিকশা করে হঠাৎ গিয়ে দু জনে উপস্থিত হল। গিয়ে শুনল মেয়ে বাড়ি নেই, মামাতো ভাইয়ের উপনয়নে তিন-চার দিনের জন্য হঠাৎ চলে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীকে কিন্তু ওঁরা তখনই ছাড়লেন না। একই জায়গা, তবে ভিন্ন পাড়ায় খানিকটা দূরে দূরে বাস; তবু জানাশুনা আছে, থিয়েটার-সিনেমায় বা নিমন্ত্রণে দেখা শোনা হয়, তার পর পরিণাম যাই হোক, বিয়ের কথায় যাওয়া-আসাও হয়েছে খানিকটা, একটু বসে যেতেই হল।

ওঁরা একটু তোয়াজ করবার সুযোগও পেলেন। পুত্রবধূ বাসনা

মেয়েটি চালাক। তীর্থ থেকে ফিরেছেন, পা ধুয়ে দিল, তার পর তীর্থের গল্প শোনাবার জন্যে সবাই মিলে ঘিরে-ঘুরে বসল।

হামানদিস্তের ছ্যাঁচা পান এল, দোক্তা এল, খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "এবার যাই বাছা।"

গিন্নী আপসোস করলেন, "পোড়া বরাৎ দেখো আমার! রাঙাখুড়ী এলেন, পছন্দ হতই মেয়েকে আমার, তা কপাল নিয়ে ঠিক এই সময়টায় মামার বাড়ি চলে যেতে হল। কাল আর হবে না, দণ্ডীঘর থেকে বেরুবে বিমল, আমি পরশুই আনিয়ে নিচ্ছি রাঙাখুড়ীমা, পায়ের ধুলো দিতে হবে।"

বাসনা বলল, "আর, ঠাকুরঝিকেও আমাদের পায়ের তলায় একটু জায়গা দিতে হবে রাঙাঠাকুরমা, আমরা ছাড়ছি না। পছন্দ আপনার হবেই।"

একটু রূঢ় শোনালেও বিন্ধ্যবাসিনী খানিকটা হাতে রাখলেনই, "ঐখানেই তো একটু ভয় দিদি, কি করে কথা দিই বল। তিন তিন বার দেখা হয়ে গেল—মায় কত্তা পর্যন্ত এলেন···তবে আসব বৈকি একবার।"

ঠোঁট টিপে একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল বাসনা, বলল, "মুখে আটকায়, সতী-লক্ষ্মীর সামনে এক হিসেবে পতি-নিন্দের মতনই শোনায় তো। · তবু আমার যখন বলবার সম্বন্ধ বলতে ছাড়ি কেন—দাদুর আর আমাদের সে পছন্দ নেই রাঙাঠাকুমা, এক সময় যা ছিল···"

এক হাতে ভর দিয়ে ভারী শরীরটা তুলতে গিয়ে একটু থমকে গেলেন বিন্ধ্যবাসিনী, প্রশ্ন করলেন, "এক সময় মানে?"

"এক সময় মানে—যখন তোমার গিয়ে আপনাকে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।"

হাতটা আলগা হয়ে যেতে ভারী দেহটা যেটুকু উঠেছিল আবার নেমে গেল, পান-ভরা গালে একগাল হেসে বললেন, "শোন কথা আচ্ছিকালের বদ্যি বুড়ীর বৌমা! রাঙাখুড়ীকে যখন নিয়ে এল, তখন উনি যে কোথায়!"

"জন্মাই নিই যেন, তা বলে জানতে নেই?"

শাশুড়ীর দিকে একটু আড়ে চেয়ে বলল, "মা দুঃখু করছিলেন না?···করছিলে না দুঃখু তুমি মা—কত্তা কেন যে আমার মেয়েকে পছন্দ করলেন না! একেবারে ছেলেবেলায়, কনে বৌটি সেজে যখন এলেন রাঙাখুড়ীমা, তখন অবিশ্যি দেখি নি, তবে বয়েস কালে তো দেখেছি, আমার ছন্দা ঠিক ঐ রকমটি হযে উঠছে—ঐ নাক, ঐ চোখ, ঐ সাজানো দাঁত, ঐ কপাল···"

বিন্ধ্যবাসিনী বেশ গা এলিয়েই হেসে উঠলেন, তাতে গুটি পাঁচেক দাঁত যা মাড়ির এধার-ওধারে নিজেদের খেয়ালমত ছড়িয়ে আছে বেশ ভাল ভাবে আত্মপ্রকাশ করে উঠল, বললেন, "হ্যাঁ বৌমা, তোমাদের শাশুড়ী-বৌয়ে এই সব হয়?······"

চালটা ধরতে পারলেও একটু হকচকিয়ে গিয়েই গিন্নী একটু আমতা-আমতা করে গুছিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী হাসতে হাসতেই বললেন, "এ ঠিক তোর বানিয়ে বানিয়ে বলা নাৎবৌ—কোথায় নাক, কোথায় চোখ তার ঠিক নেই, দাঁত তো একে একে সব গস্তে গেছে······"

বাসনা গালে হাত দিয়ে আবার শাশুড়ীর দিকে চাইল, বলল, "ওমা কোথায় যাব! রাঙাঠাকুরমা বলেন বানিয়ে বলছি!···বল নি তুমি আমায় মা?"

গিন্নী একটু লজ্জিত ভাবে হেসে বললেন, "মিথ্যে তো বলি নি,

যা দেখেছি বলছি। শুধু রংটা খুড়ীমার মতন পেলে না, অত ভাগ্যি তো-হয়-না, নৈলে…"

বাসনা এগিয়ে চলল, "আর সে মুখ চোখ না হয় দেখি নি আমি, কিন্তু চুল তো এখনও সাক্ষী দিচ্ছে। সে জিনিস এখনও অবিশ্যি নেই, থাকবার কথাও নয়, তবে মা যে বলছিলেন—সে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলের ঢাল, পিঠ ঢেকে হাঁটুর নিচে গিয়ে পড়েছে… এখনও তো তার সাক্ষী রয়েছে রাঙাঠাকুরমা…ঠাকুরঝিরও নাকি ঐ রকম, মা বলছিলেন…

হাসিতে আরও এলিয়ে পড়তে পড়তে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তুই থাম নাৎবৌ। যা দিকিন বরং খানিকটা পান ছেঁচে নিয়ে আয় —তোরই শাস্তি যেমন হাসাতে হাসাতে পানগুলো গিলিয়ে দিলি।… কি মেয়ে বাবা! কপালগুণে একটা ঝগড়াটে কাকে ধরে নিয়ে এসে সারা জীবন ভুগল মানুষটা—মুখের ঝালে পাড়ার লোকে টেঁকতে পারে না—বলে কিনা এত রূপ, তত রূপ!…"

পানের জন্যে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল বাসনা, ঘাড়টা ঘুরিয়ে মুখ টিপে হেসে টিপ্পনী করল—"কার মুখের ঝাল কার কাছে মিষ্টি খুব জানা আছে।"

ভেতরে চলে গেল।

আসবার সময় নিরুপমার সঙ্গে একটু টেপা হাসির বিনিময় হয়ে গেল বাসনার। বাকিটা সে-ই এগিয়ে নিয়ে গেল।

বাড়ি এসে বলল, "রাঙাঠাকুরমা, এসো তোমার চুলটা আঁচড়ে দিই একটু। তীর্থে তীর্থে ঘুরে কী যে অবস্থা হয়েছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু সলজ্জ কণ্ঠেই বললেন, "দিবি? না হয় দে। আর চুল! ক'গাছাই বা আছে…"

"চুপ করো তুমি। তোমার এ বয়েসে এর সিকি ভাগ থাকলেও আমরা বর্তে যাব। ঐ তো সব রয়েছেন—রায়েদের মেজগিন্নী, ওপাড়ার কুন্দপিসী—পরিষ্কার হয়ে এল মাথা, অথচ তোমার চেয়ে কত ছোট।…"

বিকালে গা ধোওয়ার সময় নাতনীর সাবানটা চেয়ে নিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তীথে তীথে ঘুরে এ-যেন চিমটি কাটলে গায়ে ময়লা উঠছে, বেশি গন্ধ-ওলা সাবান নয়তো তোর আবার?"

তীর্থের কাপড় চোপড় কাচতে দেওয়ার জন্য সরিয়ে রেখে একটি পাটভাঙা শাড়ি পড়লেন।

সনাতন যখন বেড়িয়ে-টেবিয়ে ফিরলেন সন্ধ্যার পর, বিন্ধ্যবাসিনী তখন ওপরে নিজেদের ঘরে এটা-ওটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন। সনাতন বললেন, "এই যে তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম—দেখে এলে মেয়ে? কেমন?"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু সামনে এগিয়ে আসতে, একটু দেখে নিয়ে হেসেই বললেন, "লক্ষণটা তো নাৎবৌ নিয়ে আসবার মতনই দেখছি, কিন্তু…"

বিন্ধ্যবাসিনী গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, "কিন্তু-টিন্তু নয়। মেয়ে অবিশ্যি দেখি নি এখনও, তবে এক রকম কথা দিয়ে এসেছি আমি!"

সনাতন, বিশেষ করে বোধ হয় যাওয়ার আগের কথাটা ভেবে এত বিস্মিত হয়ে উঠলেন যে পরিণামের কথা ভুলে একটু বিরক্তিই ফুটে উঠল মুখে—বললেন, "সে কি! এযে…!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। আপত্তি আছে? তাহলে পষ্ট করে না হয় বলেই দাও, দেখি।"

কোমরের হু'দিকে হুটো মুঠো গিয়ে উঠল। একটু নরম হয়ে এলেন সনাতন, তবু তর্কটা ছাড়লেন না, একটু স্তিমিত কণ্ঠেই বললেন, "তখন তুমিই বললে যে—আমার যা মত···"

"আমি মিথ্যেবাদী, আমি কথা ঠিক রাখি না—আর কিছু বলবে? কিন্তু যা-তা করে একটা কথা গেরস্তকে যে বলে দাও—মেয়ে যখন কুচ্ছিত নয়···"

"কিন্তু তুমি তো বলছ দেখই নি এখনও। না দেখেই কথা দিয়ে আসা!"

মুঠোয় কোমর হুটো চেপে একটু হুলে হুলেই বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, "কেউ দেখেও দেখতে পায় না, কেউ আবার না দেখেও দেখতে পায়, বুঝলে। এও তাই হয়েছে।···ট্যাস ট্যাস করলে কি হবে?"

দোরের কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে হু'ধারে একটু দেখে নিয়ে এসে আবার সেই ভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, "বলছিলুম, এও তাই হয়েছে। একবার চোখ মেলে ভাল করে দেখ দিকিন—আমি কি কুচ্ছিত? পঞ্চাশটা বছর তো ভোগালে।"

কোমরের ওপরের দিকটা বাড়িয়ে ধরলেন। সনাতন এতটা বিমূঢ় হয়ে গেছেন যে হাত হুটো পড়ল উঠে, চোখ বড় বড় করে বললেন, "দেখ কাণ্ড! এর সঙ্গে তোমার কুশ্রী-সুশ্রী হওয়ার কথা কি আছে! তুমি···বলতে গেলে···"

"আছে কথা। যে দেখার চোখ হারিয়েছে তার অত মাতব্বরি করতে হবে না। আমি একরকম বলেই এসেছি, ঐখানেই দিতে হবে বিয়ে। এই শেষ বলে দিলুম।"

পরের দিন সনাতন নিজেই বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পাকা কথা দিয়ে এলেন, বললেন—"গিন্নী দেখেন নি এখনও,—তাঁর জন্মেই তো এতদিন অপেক্ষা করছিলুম—আপত্তি করছিলেন বটে, তা আমি জোর করে বললুম আমি নিজে তো দেখেছি—ঐ মেয়েই দিব্যি হবে।"

"রহস্য"

রাজপুতানা-গুজরাটের এ-প্রান্তে দেখেছি বাঙালী আর তার সাহিত্য সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁদের তো মাথার মণি করে রেখেছে। দেখলাম, যদি একটু শিক্ষিত কোন বাঙালীকে পেল আর এঁদের প্রসঙ্গ উঠল তো ছাড়তেই চায় না সঙ্গ। রাজপুতানার দিকে একটু রদ-বদল হয়েছে; ওদের ধমনীর রক্ত, ওদের ঐতিহ্য এ সবের জন্য ওদের এ্যাপীল করেন বেশী করে ডি-এল রায়—তাঁর নাটকগুলির জন্য।

হোটেলওলা আমাদের তিনজনকে ছাড়তে চাইল না—আমরা রয়েছি, আমি, পান্নালালবাবু আর তাঁর সহধর্মিনী।

পান্নালালবাবু বহুদর্শী লোক; কার্যোপলক্ষে এক সময় বর্মা থেকে নিয়ে ইন্দোনেসিয়া, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি অনেক দেশ ঘুরেছেন, জীবনের একটা মোটা অংশ হোটেলে-হোটেলেই কেটেছে।

ইংরাজীতে বললেন—"ওসবে ভুলবেন না মশাই। বাঙালী প্রীতি নয়, বাঙালীর টাকার প্রীতি। আমরা জাতটা নরম, ছুটো পিঠ চাপড়ানিতে শরীর ঢিলে হয়ে যায়, দুইতে সুবিধা হয়। ও অঞ্চলে নেতাজী সুভাষ বোসের সজাতি বলে আমায় বিস্তর বোকা দণ্ড দিতে হয়েছিল। ভাল হোটেল দেখে উঠব, নায্য যা চার্জ হবে দোব—যেমন দেয় মাদ্রাজী, যেমন দেয় পাঞ্জাবী।"

লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। বেশভূষা নিতান্ত সাদা-মাঠা, সুপুরুষ, তবে চেহারায় একটা রাজপুতী রুক্ষতা আছে। কেমন একটা যেন ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে শুনছিল মিনতির সঙ্গে, এবার ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই বলল—"না বাবু, সে রকোম কুছভি মতলব নেই আমার।···বেশ তো, ওহি কথা ভাল। আপনারা আসেন, পসন্দ হোয় থাকবেন, না হোয় আপনার মর্জি আর আমার বদ-নসিবি, সেবা করতে পারিব না।"

প্রত্যেকটি কথা বুঝেছে দেখে সবাই একটু হকচকিয়ে গেছি, পান্নালালবাবু একটু বেশীই। একটু বোধ হয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন এবং মুখের ভাবে বোধ হয় তার জন্যে নিজের জিদই ধরে থাকতেন, কিন্তু একটু প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। আমি আগে থাকতে কথাতেই ভিজে ছিলাম, ওঁর মতেই মত দিলাম; দেখাই থাক না, সুবিধা না বুঝি ছেড়ে আসতে কতক্ষণ? হোটেল তো আরও রয়েছেই কাছাকাছি। পান্নালাল বাবু আর আপত্তি করলেন না।

আমরা···হোটেলে গিয়ে উঠলাম! ভদ্রলোকের নাম রণছোড় রাণা। উনিই হোটেলের মালিকও। যেমন ম্যানেজার বা ফোড়ে গিয়ে খদ্দের ধরে নিয়ে আসে সেরকম নয়। বাড়িটি বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই।

ছোট, কিন্তু বেশ ছিমছাম, গঠনের মধ্যে একটা বেশ সুরুচির পরিচয় আছে ; আর, ঠিক কোথায় কোথায় ধরতে না পারা গেলেও মনে হয় যেন সে রুচির মধ্যে রাজপুতী পৌরুষের সঙ্গে বাঙালীর কমনীয়তা মেশানো রয়েছে। পা দিতেই মনে হয় যেন একটা পরিচিত জায়গায় এসে পড়া গেল। মনে একটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনেই প্রশস্ত পোলো খেলার মাঠ, দূরে কাছে চারদিকে পাহাড়ের চূড়া, মাঠের ওপারেই খানিকটা দূরে একটার মাথায় কোন্ রাজার গ্রীষ্মাবাস, পাশেই খানিকটা নেমেই রঘুনাথজীর মন্দির। আরও দূরে গবর্নমেণ্ট হাউস, পূর্বে রাজস্থানের ইংরাজ এজেণ্টের আবাসগৃহ ছিল। আরও দূরে চূড়ায় চূড়ায় ছোট বড় সুদৃশ্য ইমারৎ সব ছড়ানো—বহু দূরে বাঁদিকের একটি সু-উচ্চ চূড়ায় শ্বেতবর্ণের মন্দির, চিকচিক করছে—পিঙ্গল পর্বতগাত্রে একটি রৌপ্য বিন্দু। দিনটা মেঘলা, ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে সূর্যরশ্মি বেরিয়ে এসে আলো-ছায়ায় একটি কল্পলোককে যেন ধরা-ছোঁওয়ার আরও অতীত করে তুলছে।

আমরা তিনজনেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছি, রণছোড়জী পেছনে এসে একটু চকিত করেই বললেন—"আপনারা দাঁড়িয়ে এখনও!"

বললাম—"এই যে, এলুম।"

রণছোড়জী এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এমন একটা মিনতির ভাব যেন গরজটা আমাদের চেয়ে তাঁরই বেশী।

বললেন—"না বাবু, আগে মুখ হাত ধুয়ে স্নান-টান সেরে একটু জলযোগ করে নিন…"

পান্নালাল বলল—"বিশেষ তাড়া কি রণছোড়জী? আমাদের তো দেখতেই আসা। আর চায়ের পর্ব এক প্রস্থ স্টেশনে সেরেই এসেছি।"

"তাহলেও স্নানটা আগে সেরে নিন বাবুজী। দেখবার সব তো যেমনকার তেমনি থাকবেই। দুটো বাথরুমে গরমজল তোয়ের রয়েছে। ...আমার বাড়িটা এখনও ভাল করে দেখা হয় নি আপনাদের।"

একটু হেসে বললাম—"বাড়িটা তো আরও যেমন কাব তেমনি থাকবে রণছোড়জী। পাহাড়ের দৃশ্য ববং সকালে যেমনটি রয়েছে তেমনটি আর থাকবে না, নয় কি ?"

উনিও একটু হেসে ফেললেন, বললেন—"বাঙালীব সঙ্গে তর্কে কে পারবে বাবুজী ? তবে বেলা বাড়লে রোদেব তেজও তো বেড়ে যাবে, ঘুরে ফিরে দেখতে কষ্ট হবে না ? চড়াই-উৎরাই করতে করতে এমনিই তো ঘেমে উঠতে হয—যদিও শীত এখনও সম্পূর্ণ যায় নি।"

পান্নালাল বললেন—"সেই হয়েছে বিপদ ; এখন বেশ ঠাণ্ডা, ববং একটু তেতে-পুড়ে এসেই নাইব।"

জেদাজেদিটা শেষের দিকে হাসিচ্ছলেই হচ্ছিল, ওঁব অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমরা প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি সেরে নিতে চলে গেলাম।

একটি বড় ঘরেই আমরা তিনজনে উঠেছি, একটা দিন থেকে রাত্রের গাড়িতেই চলে যাব। স্নান সেরে যখন একত্র হয়েছি রণছোড়জী আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রথমটা আবার একটু চকিতই হয়ে পড়তে হল, তিনজনকেই। যেন অন্য কে একজন। রণছোড়জী সকালেই স্নান সেরে খদ্দেরের জন্যে বেরিয়েছিলেন, একটি ঢ্যালতো পায়জামা পরা, গায়ে একটা পাঞ্জাবীর ওপর কালো জবাহর কোট। এখন একেবারে অন্য বেশ, বাঙালীর মত কোঁচা

করে পরা গরদের ধুতি, শুধু কোঁচার ফুলটা নাভির কাছে গুঁজে দেওয়া, খালি গায়ে একটা শাল জড়ানো, পায়ে একজোড়া চপ্পল, এদিকে মুখে একটা স্নিগ্ধ, ঈষৎ লজ্জিত হাসি।

চকিত ভাবটা কেটে গেলে প্রশ্ন করলাম—"আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন বললেন না?

"হ্যাঁ যাব বৈকি বাবুজী।" লজ্জিত হাসিটা একটু বেড়ে গেল।

"তা আমরা তো রেডি।··কতক্ষণ লাগবে আপনার পূজো সারতে?

আরও একটু বেশি লজ্জিত হয়ে পড়লেন রণছোড়জী। বললেন —"পূজো নয় বাবু, পূজো যা অল্প কিছু তা আমি সকালেই সেরে তারপর বেরুই।. ইয়ে—বলছিলাম—আপনারা তিনজনে একবার আমার ঘরে আসুন· ·"

পান্নালাল একটু ভয়েরই ভান করে উঠলেন—

"পূজোর ঘরে। না রণছোড়জী। আমরা বাঙালী মানুষ জানেনই, অর্দ্ধেক ম্লেচ্ছ। বিশেষ করে আমার জীবন হোটেলে হোটেলেই কাটে দেশ-বিদেশের, ঠাকুর-দেবতা আমায় এড়িয়ে চলেন, আমিও তাঁদের ঘাঁটাই না। আমাদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের···"

রণছোড়জী মন দিয়ে শুনছিলেন যেন কী একটা মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন, শেষ হওয়ার আগে বেশ ভাল ভাবেই হেসে উঠলেন, বললেন—"আপনারা বাঙালী বাবুরা কী হাসাতেই পারেন বাবুজী— যেমন লেখাতে তেমনি মুখে।·না, আমার এটা ঠাকুর ঘরই বটে, তবে সে-ঠাকুর নয়—আমার নিজের ঠাকুর।"

আমরা আর আপত্তি না করে এগুলাম।

হোটেলের পেছন দিকে একটা নিভৃত জায়গা। সামনেই খানিকটা

খোলা ছাত ; আর সমস্তটুকু নানারকম ফুল আর পাতা-বাহারের টব দিয়ে সাজানো। ফুলের একটা মিশ্র গন্ধ আছে, তবে একটু ভেতরের দিকে যেতেই ধূপের গন্ধ বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনের একটি ঘরে তালা দেওয়া ছিল, তার দরজার ফাঁক দিয়ে ধূপের কয়েকটি লীলায়িত মন্থর রেখা বেরিয়ে আসছে।···কোন্ দেবতার ঘর রণছোড়জীর ? ···আমরা সসম্ভ্রম কৌতুকে অগ্রসর হলাম। রণছোড়জী তালা খুললেন ঘরের। আমরা জুতো খুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তবে কোন দেবনিকেতন নয়, একটি লাইব্রেরী।

সমস্ত মেঝেটুকু একটা রক্তবর্ণের গালিচা দিয়ে মোড়া। সামনের দেওয়ালটা সবচেয়ে বেশী চওড়া, তার গায়ে সারি সারি পাঁচখানা সুদৃশ্য মাঝারি সাইজের আলমারি দাঁড় করানো। সবগুলি ভাল করে বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। এর মধ্যেও মাঝের আলমারিটি একটু বিশিষ্ট। একটু বেশী চওড়া আর চারটির চেয়ে এবং মাথাতেও আধ হাতটাক বেশী উঁচু। আর একটি বিশেষত্ব, আর সব বই যেমন বাজার থেকে কেনা সেই রকমই, কিন্তু এর বইগুলি রাঙা চামড়ায় যত্ন করে বাঁধানো ; পুটের সোনার জলের লাইন আর অক্ষরগুলা চিকচিক করছে। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এর মাথার ওপর একটি বেশ বড় তেল-রঙের ছবি। ঘরের মধ্যেকার ধোঁয়া অনেকটা বেরিয়ে যেতে আরও একটু চকিত হতে হল। চিত্রটি ডি. এল. রায়ের। তার পর দৃষ্টি আর একটু স্বচ্ছ হতে কাছে গিয়ে দেখলাম বইগুলি সবই তাঁর লেখা নাটক আর কাব্যগ্রন্থ কিংবা দেবকুমার লিখিত তাঁর জীবনী, আর তাঁর সাহিত্য আর জীবন সম্বন্ধে যা কয়েকখানা গ্রন্থ আমার জানা আছে। চিত্রটি মাল্যভূষিত দেখে বুঝলাম ইনিই রণছোড়জীর

দেবতা। আলমারির একটা তাকে একটি এলবাম, নিশ্চয় ডি. এল. রায়ের নানা অবস্থার ফটো বা চিত্র। এটিও একটি টাটকা ফুলের মালা দিয়ে বেষ্টিত।

আর চারটি আলমারিতে পাঁচমিশালি বই। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আরও কয়েকজনের নাম দেখলাম। লক্ষণীয় এই যে নাটকের দিকে রণছোড়জীর পক্ষপাতিত্ব বেশী, বিশেষ করে পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক নাটক যাতে উগ্ররসের ছড়াছড়ি একটু বেশী। যতদূর পরিচয় আছে, কোনটিই বাদ পড়েছে বলে মনে হল না ; যেন খুঁজে খুঁজে সন্ধান নিয়ে আনিয়েছেন।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে বড় কৌতুক বোধ হল। ঘরে আরও বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের চিত্র রয়েছে—ব্রোমাইড এন্‌লার্জ-মেণ্ট রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম, সঞ্জীব, আরও দু'একজন। সবাই মাল্যপরিহিতও। কিন্তু ডি. এল. রায় এত একক আর বিশিষ্ট যে রণছোড়জী যেন সন্দেহাতীতভাবেই এইটে প্রতিপন্ন করতে চান যে আর যার কাছে যাই হোক, তাঁর দেবসভায় ডি. এল. রায়ই দেবরাজ ইন্দ্র।

আরও বাকি ছিল, রণছোড়জী আমাদের এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে নিয়ে চলেছেন।

ঘরটিতে চেয়ার টেবিলের ঐকান্তিক অভাব। ডি. এল. রায়ের আলমারির সামনে একটি কারুকার্যখচিত জয়পুরী টীপয়। তার ওপর একটি ফুলদানিতে টাটকা ফুল। একপাশে একটি নীচু চৌকির ওপর কার্পেটের সঙ্গে মেলানো টকটকে লাল রঙের সুজনি বিছানো। রণছোড়জী আমাদের বসতে অনুরোধ করলেন। বলা বাহুল্য আমরা অভিভূত হয়েই পড়েছিলাম, মুখোমুখী হয়ে বসলাম।

ওঁর মুখে সেই সলজ্জ হাসি। একটু যেন প্রতীক্ষাই করলেন প্রশ্নাদির জন্য, তারপর নিজেই করলেন প্রশ্ন—"কেমন দেখলেন বাবুজী ?"

অভিভূত হয়েই বললাম—"অদ্ভুত আপনার ঠাকুর ঘর, আর অদ্ভুত আপনার নিষ্ঠা রণছোড়জী।...এরকমটা আর দেখেছেন পান্নালালবাবু ?"

পান্নালাল বললেন—"কোনও বাঙালীর ঘরেও চোখে পড়ে না এ জিনিস।"

...এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে সব কিছু শুধু দেখেই যাচ্ছিলেন, পান্নালালবাবুর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একটু নিম্নকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"সব পড়েছেন উনি ?"

উত্তরটা দিলেন রণছোড়জী নিজেই। স্ত্রীলোক, বোধ হয় চোখে মুখে সম্ভ্রমটা আমাদের চেয়ে বেশি করেই ফুটে থাকবে, তাইতে রাজপুতী শিভ্যালরিকে উদ্বুদ্ধও করে থাকবে আরও বেশি করে. বললেন—"পরীক্ষা করো মা।"

এমনি বলা নয়। চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠেছে, মুখে এক ঝলক রক্ত এসে গৌরবর্ণ মুখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই সলজ্জ হাসি গিয়ে রাজপুতী গোঁফ জোড়াটায়ও একটা পৌরুষ উঠেছে জেগে। পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের সময়ও দিলেন না, আরম্ভ করে দিলেন।

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আবৃত্তির পর আবৃত্তি। প্রথমে ডি. এল. রায়ের সমস্ত বই থেকে—বাছা বাছা অংশ—একটু-আধটু নয়, বীররস জমেছে এমন দৃশ্যকে দৃশ্য একেবারে।

ডি. এল. রায় শেষ হলে অন্য কয়েকটা বই থেকেও এইভাবের আবৃত্তি করে গেলেন রণছোড়জী। ক্রমেই এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন যেন স্থানকালপাত্র সব বিস্মৃত হয়ে বসেছেন।

এক সময়, যেমন হঠাৎ আরম্ভ করেছিলেন, তেমনি হঠাৎই এক জায়গায় মাঝপথেই ছেড়ে দিয়ে আবার সংবৃত হয়ে বসলেন। সেই লজ্জিত হাসি। বললেন—"বড়ে জোশিলী তকড়ির, কেঁও বাবুজী ?"

—অর্থাৎ খুব উত্তেজনাময় বক্তৃতা সব, নয় কি বাবু ?

একটু মানানসই করেই বললাম—"হবে না ? কাহিনী কাদের ? রাজপুত, মারাঠা, জাঠ, শিখ…"

সেই রকম সলজ্জ হাসি। উত্তর হল—"ভাষা ভি বড়ি জোশিলী বাবুজী। আর, বলছেন বটে কিন্তু হালের ইতিহাসই তো প্রমাণ করছে এযুগের রাজপুত বলুন মারাঠা বলুন—সব বাঙালীই—ইংরেজের বনেদও ঢিলে করে ছেড়ে দিলে। সব শেষে নেতাজীই কী আঘাতটা হানলেন দেখুন না একবার !…"

একটা কথা বলা হয় নি। একেবারে গোড়াতেই রণছোড়জী যে বাংলা বলেছিলেন তারপর বরাবর হিন্দীতেই চালিয়ে গেছেন। অতিরিক্ত স্বজাতি-প্রশংসায় একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েই আমি প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য সেই কথাটাই তুললাম, বললাম—"আপনার বাংলার ওপর তো চমৎকার দখল রণছোড়জী, বাংলাতেই কথা কইবেন না আমাদের সঙ্গে ?"

সসংকোচে জিভ কাটলেন, বললেন—"এটা আমার ফাঁকি বাবুজী। বাংলায় আমি কথা চালাতে চাই না কোন বাঙালীর সঙ্গে। বড় পবিত্র ভাষা বাবুজী, উচ্চারণে, শব্দপ্রয়োগে তার মর্যাদা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমার। এ যা শুনলেন, ওঁদের বাঁধা বুলি আউড়ে গেছি আমি। একটু-আধটু কখনও কখনও যা বলি—তা কেতাব পড়ে পড়ে আর বাঙালী বাবুদের কথা শুনে শুনে যেটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছি…"

লজ্জিত দৃষ্টি মুখের ওপর তুলে বললেন—"দিন কতক কলকাতায় ছিলুম বাবু—একটা হোটেল করেই—বাঙালী পাড়াতেই—আমার তীর্থবাস বলতে পারেন ; কিন্তু টেঁকাতে পারলুম না…"

হাসিটা মলিন হয়ে আসায় বুঝলাম প্রসঙ্গটা তোলা ভুল হয়েছে।

তাড়াতাড়ি পালটে নেওয়ার অন্য উপায় না মনে পড়ায় ওঁকে আবার আবৃত্তিতেই উৎসাহিত করলাম, বললাম—"আরও কিছু শোনান তাহলে রণছোড়জী, যাই বলুন না, কেন আপনার মুখে এঁদের ভাব ভাষা যেন আরও বেশী করে ফুটে উঠছে।"

এমন কিছু বাড়িয়েও বলি নি। রণছোড়জী বাংলা ভালরকমই বোঝেন, তার ওপর স্বয়ং রাজপুত, বীররসের কারবারী, ভাবের দিকটা স্বতঃই তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠবার কথা, কিন্তু একটু বিস্মিত হয়েই দেখলাম ভাষার দিকটাও প্রায় ত্রুটিহীন। গোড়ায় কথাবার্তায় যেটুকু বললেন তাতে উচ্চারণে খানিক খানিক দোষ ছিল, কিন্তু আবৃত্তিতে ছ, জ প্রভৃতি দু-একটা অক্ষরে একটু-আধটু এদিক-ওদিক হওয়া ছাড়া আর কোন খুঁতই নেই যেন।

একটু লজ্জিত ভাবে হেসে রহস্যটা বললেন রণছোড়জী। গত গ্রীষ্মে এক বাঙালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসে ওঁর হোটেলে ওঠেন। আসেন বাংলা থেকেই, তারপর ঘোরাঘুরিতে শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনুকূল জলবায়ু দেখে প্রায় মাস দুয়েক থেকে যান এখানে। শিক্ষিত লোক, বিশেষ করে নাটকের খুব ভক্ত, নিজেও অংশ গ্রহণ করে থাকেন, রণছোড়জীর আগ্রহ দেখে তিনিই তাঁকে এই দু-মাস ধরে আবৃত্তির ভঙ্গি আর উচ্চারণে তালিম দিয়ে যান।

ভদ্রলোকের নামে আবার একচোট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন রণছোড়জী—যেমন হয়ে উঠেছিলেন আবৃত্তির সময়। এতটা যে,

উঠে পড়েও অঙ্গসঞ্চালনে তাঁর বলবার স্টাইল নকল করে খানিকটা নূতন আবৃত্তিও করে গেলেন ; তার পর, যেমন ওঁর অভ্যাস দেখলাম, নিজের ভাবাবেগেই হঠাৎ একটু লজ্জিত হাসি নিয়ে এসে আবার বসে পড়লেন।

বললাম—"চমৎকার উপদেষ্টা পেয়েছিলেন আপনি রণছোড়জী।"

আবার একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে গুরুর গুণপনা বর্ণনা করে গেলেন, শেষে বললেন—"শুধু তাই নয় বাবুজী, বাঙালীর কিসে এত জোশ্—ভাবে, ভাষায়, কর্মে তার গোড়ার রহস্যটাও রামেন্দ্রচন্দ্রজী আমায় বাৎলে দিয়ে যান—কি করে বাঙালীরা বোমায় এত মেতে উঠল, কি করে ডি, এল, রায়ের কলমের ওরকম জোর, কি করে নেতাজী···"

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, পান্নালাল বললেন—"চলুন, বেড়াতে বেড়াতেই শুনব, হাতে সময় তো কম।

রণছোড়জী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন—"ঠিক, ঠিক। আর তার বন্দোবস্ত আমি আপনাদের জন্যেও করে দিয়েছি, ভাবতে হবে না। সব বাঙালীই তো এক।"

ঘুরে ফিরে দেখে শুনে বেড়াবার মধ্যে আর এ আলোচনা আসতে পারল না। আমরা বেশ একটু পরিশ্রান্ত হয়েই যখন হোটেলে ফিরলাম তখন দুপুর একটা। শীতকাল হলেও শীতের শেষের দিক ; পাহাড়ী জায়গা, তাতটা বেশ একটু ছেড়েই উঠেছে।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে রণছোড়জী আমাদের আহারের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন, একটু ঘরোয়া আলোচনার অবসর পাওয়া গেল। বেশীর ভাগ ওঁকে নিয়ে—ওঁর বাঙালী-প্রীতি, তার কারণ কি কি হতে পারে, এই সব।

পান্নালালের স্ত্রী বললেন—"হ্যাঁ একটা কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন আপনারা, চাপা না পড়ে যায়। বাঙালীর ভাব ভাষা কর্মের এই উদ্দীপনার রহস্যের কথা উনি যে বলতে যাচ্ছিলেন সেটা কি? আমরা তো জানি কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ আছে, তার অতিরিক্ত কি কিছু…?"

রণছোড়জী এসে খবর দিলেন খাবার তোয়ের।

সেখানে যেতেই রহস্যটা একরকম নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে ধরল; রণছোড়জী একবার টেবিলের দিকে চেয়ে নিয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাত্র যা একটু প্রসন্ন হাসি হাসলেন প্রথমটায়। আমরা গিয়ে তিনটি চেয়ার দখল করলাম।

পুরোপুরি খাঁটি বাঙালী রান্না। শাক, শুক্ত, ডালনা, চচ্চড়ি, দাল, মাছের ঝোল, মাংস, অম্বল। কিন্তু আধাআধি লঙ্কা। চেরা, আস্ত, ভাজা, বাটা। মাছের ঝোল আর মাংসের কালিয়ায় গোলা লঙ্কার অতিরিক্ত গুঁড়ো লঙ্কা ছড়ানো, রণছোড়জীর ভাষায় বলতে গেলে 'ঘোশে' একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে রয়েছে।

রণছোড়জী আবার একটু কৃতার্থতার হাসি হেসে বললেন—এবার বাংলাতেই বললেন—"বাবুজী, রমেন্দ্রচন্দ্রজী বোলেন—রণছোড়জী, শ্রেফ মরচাই, শ্রেফ মরচাই, আর কুছভি নোয়। আমাদের খাতায় বহুত তারিফ ভি ক'রে গেছেন বাবুজী রসুইয়ের।

ক্ষিধের চোটে বিশেষ কিছু ফেলতে পারা গেল না, ওঁর আগ্রহের জন্য কিছু বলাও গেল না। একটা যে কৌতূহল লেগেছিল, সেটা কিন্তু চাপতে পারলাম না, বললাম—"খাতাটা একবার দেখতে পারি রণছোড়জী?"

বললেন—"অভি অবশ্য বাবুজী। আপনাদেরও একটু লিখে দিতে হবে।"

এনে দিলেন।

দীর্ঘ প্রশংসার নীচে ডান দিকে নামটা লেখা। আমাদের কিন্তু বাঁ দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল; তিনজনেরই। লেখা আছে—

হাল সাকিন কবিমগঞ্জ

জেলা বরিশাল।

স্বামী কৃষ্ণানন্দের সংসার

তীর্থ করতে গিয়ে মোড়ল-গিন্নীর স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ঠিক বারো বৎসর পরে।

গ্রামের একটি দলের সঙ্গে প্রভাস-পুষ্কর-মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে তিন দিন হল প্রয়াগে এসেছে। মাসখানেক হল কুম্ভমেলা শেষ হয়েছে, ঝড়তি-পড়তি সাধু-সন্ন্যাসী এখনও কিছু কিছু আছে এখানে। দর্শন করে করে বেড়াচ্ছে এমন সময় যাত্রীদের কাছেই শুনল ত্রিবেণী থেকে মাইল খানেক দূরে একটি বাবলা গাছের তলায় কৃষ্ণানন্দ স্বামী বলে একজন মহাপুরুষ এসে ধুনি জ্বেলে বসেছেন, ইয়া ইয়া জটা মাটিতে লুটোচ্ছে, কষ্টিপাথরের মত গায়ের অমন রং দেখা যায় না, বেশি কথা কন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখতে গেল সবাই।

একটা বড় বাবলা গাছের তলায় খড়ের ছোট্ট একটি কুটুরি, তার সামনে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন স্বামীজী। এরা গিয়ে সন্ধ্যার সময় পৌঁছলো, হাত জোড় ক'রে বসল ঘিরে। যার যা দেওয়ার ধুনির সামনে পাতা একটা থালায় ছুঁড়ে দিল।

একটু হেসে চাইলেন থালাটার দিকে ; তার পর বোধ হয় সবচেয়ে বয়সে বড় দেখে মোড়ল-গিন্নীর দিকে চেয়েই হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে কি ইশারা করলেন।

আরও জনপাঁচেক ছিল আগে থাকতে বসে, তার মধ্যে ছুটি বাঙালী স্ত্রীলোক, একজন একটু নিম্নস্বরে বলল—"পাঁচটার বেশি রাখেন না, সেই কথাই বললেন।…এই যে।"

নিজের আঁচলের একটা গেরো তুলে দেখাল।

পয়সা, ডবল পয়সা মিলে আটটি পড়েছিল। মোড়ল গিন্নীই অগ্রণী হয়ে তিনটে তুলে কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে রাখল। একটা তামার ঘটি ধুনির একধারে রাখা ছিল, সেটার দিকে ইশারা করলেন। সেই স্ত্রীলোকটিই বলল—"ও পাঁচটা ঘটিতে রেখে দিতে বলছেন। ভোগের খরচ আছে তো।…কী যে মাহাত্ম্যি বাবার!"

হাত ছুটো জুড়ে কপালে বার ছুই ঠেকাল। মোড়ল-গিন্নী একটু উঠে পয়সা পাঁচটি ঘটির মধ্যে রেখে দিল। স্বামীজী হাত ছুটো হাঁটুর ওপর চিৎ করে রেখে চোখ বুজলেন।

কথা যে একেবারে কন না এমন নয়। একটু আসনে কাটল, তার পর যেন যোগ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠে একটা বড় গোছের শ্বাস মোচন করে সব দিকে চাইলেন, প্রশ্ন করলেন—"ঘর কাঁহা? বঙ্গাল?"

মোড়ল-গিন্নীই জবাব দিল—"ঘর আমাদের সবারই হুগলী জেলার মালঞ্চা গাঁয়ে বা…

কথাটা শেষ করতে গিয়ে যেন হঠাৎ গলায় আটকে গেল। মোড়ল গিন্নী একটু চেয়ে রইল মুখের দিকে, জ্রুদুটিও একটু কুঁচকে উঠল। তখুনি সামলে নিয়ে আবার বলল—"হুগলী জেলার মালঞ্চ গ্রামে।"

প্রশ্ন করল—"পায়ের ধুলো পড়েছে কখনও সেখানে?"

"নেহি। কভি নেহি।"

"যাবেন একবার কিরপা ক'রে?"

"যায়গা, যায়গা।"

"কবে কিরপাটুকু হবে?"

এবার শুধু ওপরের দিকে তর্জনীটা তুললেন। সেই স্ত্রীলোকটি টীকা করল—"বলছেন আর কি সবই তাঁর ইচ্ছে হবে। আহা!"

আবার হাত দুটো জোড় করে কপালে বার দুই তিন ঠেকাল।

স্বামীজী চোখ বুজলেন।

জটায় সমস্ত শরীরটা ছেয়ে গেছে। দাড়ি গোঁফে অত বড় মুখখানারও আর কিছু বাকি নেই, এদিকে সময়টাও সন্ধ্যা, প্রথমে অতটা বুঝতে পারে নি মোড়ল-গিন্নী, শুধু স্মৃতির কোথায় যেন অস্পষ্ট কি একটা জেগে উঠব উঠব করছে, তার পর গলার আওয়াজ শুনতেই সবটা ওপরে ভেসে উঠল। ভালো করে মেলাবার জন্যই প্রশ্নগুলা করল। অনেকটা ভারী হয়ে এসেছে গলা, এদিকে খেয়ে দেয়ে নি-ফিকিরে ঘুরে ফিরে শরীরও ভারী হচ্ছে, চেনচার যা সব ঢাকা পড়েছে, কেউ ব'লে দিলেও সেই মানুষ বলে বিশ্বাস করা শক্ত, তবু চল্লিশটা বছর একসঙ্গে ঘর করা তো, শেষ পর্যন্ত আর সন্দেহের কিছু রইল না।

আর সবার মধ্যে এক বোধ হয় দুলালের মা সাদৃশ্যটার একটু আঁচ পেয়ে থাকবে—এমনি একটু সাধারণ সাদৃশ্য, যা দুটো মানুষের

মধ্যে এসে পড়তে পারে। নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠেই বলল—"স্বামীজীর কোথায় যেন আমাদের সিদু ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু—"

"সাধু সন্নিসীদের নিয়ে ঠাট্টা নয় ঠাকুরঝি।"

—একরকম ধমক দিয়েই উঠল মোড়ল গিন্নী, ঠাট্টার সম্পর্ক, সুবিধাই হোল। ও আলোচনা ঐখানেই শেষ হয়ে গেল।

সিধু মোড়ল জেল-পলাতক আসামী। পাঁচ বছরের শাস্তি হয়েছিল, মাস ছয়েক খেটে উধাও হয়, তার পর এই বারোটা বছর গেছে। মোড়ল গিন্নী ঠিক করেছিল এবার গিয়েই শ্রাদ্ধটা সেরে নেবে, তার আগে, যখন এসেছেই, মাথাটা মুড়িয়েই যাবে প্রয়াগে, পরের দিনই মোড়াবার কথা—মতটা বদলে ফেলল। সবাইকে বলল—"ছেরাদ্দর আগেই মোড়াব? ছেলেকে বলেও আসি নি, না হয় পরেই একবার এস্‌বো গিয়ে ত্যাখন।"

পরের দিন আবার কৃষ্ণানন্দস্বামী-দর্শনে গেল সবাই।

সন্দেহের যদিই বা কিছু বাকি ছিল, ভালো করে মিটিয়ে নিল। তার পর একটু বুদ্ধি খাটালো।

বুদ্ধি খাটিয়ে সন্ধ্যা উৎরে যাওয়ার পরই পৌঁছেছিল, যখন লোক যায় কমে। যতক্ষণ আর সবাই উঠে গিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার না হয়ে গেল ততক্ষণ উঠল না, তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা ক'রে করে বসে রইল, বসিয়ে গেল স্বামীজীকে। তার পর স্বামীজীর কাছে ধুনির ছাই নিয়ে সবাই মিলে খানিকটা চলে এসে হঠাৎ যেন চকিত হয়ে বলে উঠল—"চারটে নোব কেন, মনে হল যেন বেশিই তুলে নিছু অন্ধকারে, মনটাও তো ওঁর ছিচরণে প'ড়ে।…রোস্ তো দেখি।"

আঁচলের গেরো খুলে পয়সাগুলো গুণে বলল—"এই দেখ্,

একেবারে ছ'টা। মুয়ে আগুন আমার—এই মন নিয়ে তিথি করতে আসা!"

মুঠোতেই রেখে নিয়ে বলল—"তোরা র', দিয়ে এসি। ভাগ্যিস খটকা লাগল।"

দুলালের মা বলল—"খটকা কি আপনিই নেগেছে? নাগিয়ে দিয়েছেন বাবা। মাহাত্মিার কথা আমরা আর কি বুঝব?"

সিহু মোড়ল গাঁজা সেজে ধুনি থেকে আগুন নিয়ে কলকেয় দিচ্ছিল, দূর থেকে আবছায়া দেখে একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"কেয়া হ্যায়?"

মোড়ল গিন্নী বলল—"হয়েছে। আর···"

"ও, তুই নাকি?"

"পারলে চিনতে?"

"সন্দেহ হয়েছিল, তার পর যখন বললি হুগলী জেলার মালঞ্চা গেরাম···"

মোড়ল গিন্নী তাড়াতাড়ি চাপা দিল, বললে—"থাক্, সময় নেই অত। বলতে এনু—আজ খানিক রেতে এসবো—রেতে আর বেরোও-টেরোও না তো?"

"সে সব অব্যেস আর থাকে?···এস্ বি, তা ওরা রয়েচে যে···"

"রামায়ণ শুনতে যাই ত্রিবেণী ঘাটে। আমি মাথাব্যথার নাম করে পড়ে থাকব। এসি।"

পয়সার কথা তাড়াহুড়োর মধ্যে ভুলেই গিয়েছিল, মুঠোতেই আছে, ওরা জিজ্ঞেস করতে বলল—"পোড়া কপাল। বলতে হেসে বললেন—ওকি তুই ভুলে গিয়েছিলি? দিয়েছিনু ভুলিয়ে। কত সাধ্যি-সাধনা করনু—দেরিও হয়ে গেল তাইতে খানিকটে—বয়ে গেছে নিতে—বলেন, ক্ষেপেচিস? দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নোব?"

দুলালের মা বলল—"নেন কখনও? আমি ত্যাখনই আঁচ করেছিনু। তুমি নাকি হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলে, আর পেছু টুকলুম নি।…ও দুটি পয়সা কপালে ঠেকিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রেখো, কপাল তোমার ফিরে গেলে, এই বলে দিনু, নিকে রাখোগে।"

রামায়ণ শোনবার জন্যে ঘাটের কাছাকাছি পর্যন্ত একসঙ্গেই এল সবাই। মোড়ল-গিন্নী একটু আগে থাকতেই গেয়ে রেখেছিল, রগ দুটো টিপে ধরে বলল—"না, কেরমেক বেড়েই যাচ্ছে, আমায় আর শুনতে দিচ্চে না পোড়া আধ-কপালে। পাপের শরীল তো, তোরা এস্‌গে যা। আমি গিয়ে পড়ে থাকি।"

কুঁড়ের সামনে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন শহরের এদিকের কোথায় ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজল।

মোড়ল-গিন্নী প্রশ্ন করল—"তার পর?—কি কাহিনী বলো।"

"কাহিনীটে তো পেল্লায়—একটা দিন নয় তো, বারোটা বছর। তুই আগে ঐদিক'কার খবর বল্‌—এইবার মনে করছিনু একবার যাব উদিক পানে। বেটারা হাল ছেড়ে দিয়ে নিচ্চিন্দি হয়েছে…"

"হয়েছে নিচ্চিন্দি?"

"বছর তিনেক আগে একটা রাম ভাঁওতা দিলুম—ওরা জানে মরে গিয়েছি। তাই যাব যাব করছিনু, তুই এসে পড়লি। খবর কি বল?"

"খবর ছেলেটা বড় হয়েছে, পাঁচ বছরেরটি রেখে জেলে গেছলে তো! গাঁয়ে সুনাম নেই; একে তো বাপেরই বেটা, তার পর রোজ-গারের দিকে নজর নেই। মেয়েটার বিয়ে দিনু, একটি ছাওয়াল নিয়ে রাঁড় হয়েছে। কাঁচা বয়েস, মনে করি বিয়ে দিয়ে দিই—তা পয়সা চাই তো। গাঁয়ে থাঁটি, দুটো ছাগল রয়েছে, ছানা দেয়—এই

রোজগার। এর ওপর বারোটা বছর কেটে গেল—সবাই বলে ছেরাদ্দটা সেরে নেও এবার—ভাবনু তাহলে সব তিথি করতে বেরুচ্চে, ঘুরেই এসি একবার, প্রেয়াগে মাথাটাও মুড়িয়ে এসব এমনি···তা, আর ফিরচি নে বাপু—এবার তো·· ”

সিদ্ধু মোড়ল বাধা দিল—"ব', অনেকটা তো শুনলুম, একটু বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই।"

কয়েকটা টানের পর একটু বেশ বড়ো গোছের সুখটান দিয়ে ধোঁায়া ছেড়ে একটু বুঁদ হয়ে ব'সে রইল, তার পর প্রশ্ন করল—"না ফিরে করবিটা কি শুনি একবার ?"

"শোনো কথা ! সঙ্গে সঙ্গে থাকব। ঘুরব সঙ্গে সঙ্গে। সেও তো সংসার-ধম্মই"···

"সেবাদাসী হয়ে, এই তো ? বলি, সুনামটা নষ্ট করতে চাস ?"

"কার সুনাম ?"

বোধ হয় অন্ধকারে একটু হেসেই ফেলে থাকবে মাঝামাঝি কথাটা বলে ; একটু সামলে নিয়ে বলল···"আমার আর সুনাম-বদনাম কি ? —যার সঙ্গে থাকবার কথা তার সঙ্গেই তো থাকব।"

"হুঁ ··"

টানা শব্দটুকু ক'রে প্রশ্ন করল—"ছেলেমেয়ে দুটো ?"

"যা হবার তাই হবে। আমি আর ফিরছিনে তা' বলে।"

আবার গোটাকতক টানের পর একটা সুখটান দিয়ে একটু বুঁদ হয়ে বসে রইল সিদ্ধু মোড়ল, তার পর বলল—"তার মানে, সতী-লক্ষ্মী হয়েচিস। তাহলে যা বলি সতী-লক্ষ্মীর মোতন কান দিয়ে শোন দিকিন। কাল থেকে ভেবে ঠিক করেছি একটা, নিচ্চিন্দি হয়ে বসে নেই। সাটেই বলি, আবার গিয়ে রগ টিপে পড়ে থাকতে হবে তো।

…বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেরাদ্দটুকু সেরে নিবি আগে—এই এক নম্বর।”

“শোনো কথা! সোয়ামী বেঁচে, তার ছেরাদ্দ!”—একবারে শিউরে উঠল মোড়ল-গিন্নী।

“ঘটা করে ছেরাদ্দ করবি। ভালো করে সেরে না ফেললে সন্দো থেকেই যাবে। আইন আবার টেনে তুলতে পারবে। ট্যাকা দিয়ে দোব—সিঁদ কেটেই যে রোজকার করতে হবে এমন কথা তো শাস্তোর বলে দেয় নি, ভালো পথেও দেখলাম। আয় আছে ভালোই।”

কি বলতে যাচ্ছিল মোড়ল-গিন্নী, সিদ্ধু বলল—“চুপ ক'রে শুনে যা। সংসার-ধম্মের কথা বলছিলি—পাকা ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি আমি। …যাবার আগে মাথাটাও মুড়িয়ে নে এখানে…”

মোড়ল-গিন্নী এতটা হকচকিয়ে গেল যে, ঝোঁকের ওপর একটু উঠেই পড়ল; পুনর্মিলনের কথা ভুলে গিয়ে আগেকার মতই বলে উঠল,—“শোন অলুক্ষুনে কথা একবার। গ্যাঁজা খেয়ে মিন্সের মাথা খারাপ হয়েছে—নিজে বেঁচে—পরিবারকে বলে—মাথা মুড়িয়ে-যা প্রেয়াগে।”

“তড়পাস নি। অলুক্ষুনের হবে না। চুলগুলো দিয়ে যাবি, জটায় খাইয়ে নোব। তার পর শোন, সময় বয়ে যাচ্ছে। টাকা দিচ্ছি, কিছু নিয়ে যা লুকিয়ে-চুরিয়ে। তার পর আমিও এসচি গাঁয়ে…”

“এসবে!!”—একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল মোড়ল-গিন্নী।

“এস্‌বো বৈকি—তবে আর সংসার-ধর্ম করার কথা বলছি কেন। তবে একেবারে কি গাঁয়ের মধ্যে এসবো? দু গাঁ পরে বাকুলের মশানের কাছাকাছি একটা বড় পাকুড় গাছ আছে সেখানে গিয়ে ধুনি জ্বালব—তোরা যা, তার দিন আষ্টেক পরে। ছেলেটাকে নিয়ে এসবি প্রেথম দিন, তার পর তুই আর এসবি নি। লোকে বলবে মাগী মহাপুরুষকে

নষ্ট করবার ফিকিরে আছে। আমি ছেলেটাকে ভক্ত করে নিয়ে শিষ্যি করে নেবো পরে। ওরই হাতে ট্যাকা পয়সা পাঠাব—ব্যবস্থা করে থাকবি—ভালই থাকবি। লোকের নজর বোধ হয় একটু পড়বে প্রেথমটা"…

মোড়ল-গিন্নী বলল—"সে তুমি ভেব নি। একটা ব্যাপার হয়ে গেল—আজই সন্দেয়—কথা উঠে গেছে—সাধু-সন্নিসীর নেক-নজর পড়ে গেছে আমার ওপর ..."

"ভালোই হোল। বছর খানেক যাওয়া আসা করব। তার পর কায়েমী হয়ে ঐখানে বসে গুছিয়ে সংসার ধর্ম করব। তুই ভাবিস নে।

ঘটা করেই শ্রাদ্ধটা করল মোড়ল-গিন্নী। ক্রমে মেয়েটার ভালো করে বিয়ে দিয়ে তাকে স্থিতুও করল। বিগড়ে যাচ্ছিল ছেলেটা, সেটাও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশে শুধরে উঠতে লাগল।

কারুর নজর পড়ল না, সন্দেহ হোল না। দলের যারা গিয়েছিল তারা তুলালের মার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে বেড়াতে লাগল—"আমরা তখুনই বলেছিনু—ও শুধু তুটি পয়সা নয়, কপাল ফিরে গেল তোমার।"

আলোক

পূর্বে যে দুটি ঘটনা ঘটে গেল তাইতে ছেলেটির প্রতিও আমার মনটা একটু বিরূপ ক'রে তুলেছিল, নইলে ওভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না প্রথমটা।

মাস দেড়েকের মধ্যে পর পর দুটি অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আমার। বাড়িতে ব'সে আছি, একজন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের বাঙ্গালী আস্তে আস্তে উঠে এসে সিঁড়ির পাশের থামটা ঘেঁসে দাঁড়াল। দেহটা খুব শীর্ণ, গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, নিজের গায়ের মাপে তৈয়ের নয়, খালি পা, মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় ক্ষুর-কাঁচির সঙ্গে অনেক দিনই দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

চিনি এদের। ভারতের রাজনীতিতে কয়েকটি পাহাড়ে ভুল যে হয়ে গেছে এরা তারই একটির সাক্ষ্য। জাতের একটা বড় অংশ বৃন্তচ্যুত হয়ে এই রকম পঙ্গু, বিকৃত হয়ে গেছে।···একবার একটা প্রশ্ন উঠেছিল—প্রশ্নটা স্থায়ী, এখনও ওঠেই—বড় বড় জায়গীরগুলো এরকম করে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাগ করা থাকবে কেন, তাদের অনেকে অযোগ্য হলেও? বড় মহল থেকেই উত্তর হয়েছিল —তারা এক সময় আত্মত্যাগ করেছে, দুঃখভোগ করেছে, এখন তার পুরস্কার পাবে বৈকি!

কথাটা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন এনে ফেলে, এদের ত্যাগ, এদের দুঃখ-ভোগ, কার চেয়ে কম? উত্তর হবে—এদের দুঃখ-বরণ, এদের ত্যাগ, সে তো স্বেচ্ছাকৃত নয়!

সঙ্গতও উত্তরটা, তবু কিন্তু আর একটা প্রশ্ন এনে ফেলেই—

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে তাহলে এদের এ দুঃখবরণ করাল ? এরকম সর্বত্যাগী, সর্বহারা করে ছাড়ল ?···কে, কিসের বলে এ অধিকার অর্জন করেছিল ?

যাক, রাজনীতি চলে প্রশ্ন আর উত্তরের ওপর নির্ভর ক'রে, এর আর অন্ত নেই। রাজনীতির এইটেই নীতি! যার ভোগ, যার হাতে শক্তি তার উত্তরগুলোও ভোগপুষ্ট, শক্তিমান ; যার দুর্ভোগ তার প্রশ্ন-গুলোও দুর্বল। এই চলে আসছে আবহমান কাল, ভেবে ফল কি ? লোকটার কথায় ফিরে আসা যাক।

বিরক্ত হয়েছি, আমায় দোষ দেওয়া যায় না। সবাই এদের ওপর বিরক্ত, তার সঙ্গে আমিও একজন। এরা কাজ করবে না।

সব কার্য বা পরিণামের যেমন একটা কারণ আছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এরও তেমনি আছে একটা। কথাটা হচ্ছে ভিক্ষা একটা বৃত্তি, আজ দশ বৎসরের স্বাধীনতায় যারা এই বৃত্তিতেই পুষ্ট—যারা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেল না, পেল যাযাবরের ছিন্ন শিবির, জমি ছেড়ে এসে জমি পেল না, তার পরিবর্তে পেল 'ডোল', মুষ্টিভিক্ষা, তারা অন্য বৃত্তির কথা ভাববার অবসর পেল কোথায় ? কথাটা ভাবলে বিরক্তি হয়তো আসতে পায় না—কিন্তু বিরক্তি নিরোধ করবার জন্য মানুষ অত ভাবতেও পারে না তো। নয়তো সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা যায় যে ভিক্ষার মত অমন স্বচ্ছন্দ, অনায়াস বৃত্তি আর দ্বিতীয়টি নেই, শুধু একটু চেষ্টা করে লজ্জাটুকু দেহমন থেকে নামিয়ে দেওয়া।

কি কথায় কি কথা এসে পড়ছে। দেখেছি, এদের প্রসঙ্গ উঠলেও চিন্তাতে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে, বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারা যায় না—ওরা যেমন বেশ গুছিয়ে বলতে পারছে না।

বিরক্তভাবে বললাম—“কি, সাহায্য চাই ? পরিবারসুদ্ধ সবার দুদিন থেকে উপোস, একটা রুগ্ন মেয়ে ধুঁকছে, এই তো ?

পূর্বের একটা অভিজ্ঞতায় মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল, সেও এই রকমই একজন। ঐ বলে নিয়ে গেল টাকা। নিশ্চয় আরো অনেককে ব'লে কিছু ভালরকম সংগ্রহ হয়ে থাকবে সেদিন, বাজারের ওদিকে গিয়ে নজরে পড়ল একটি সের দুয়েকের মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছে, রেট যা যাচ্ছিল তাতে সাড়ে তিনটাকার কাছাকাছি না হয়ে যায় না।

প্রশ্নটা করে কিন্তু নিজেরই মনটাতে যেন আঘাত লাগল, শুধু দারিদ্র্যের জন্যই যে এরা দায়ী নয় এমন নয়তো, এরা যে মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে এর জন্যই বা কতটুকু দায়ী এরা ? একটু যে অনুশোচনা এল, তাতে ওদের মনুষ্যত্বে আবার ফিরিয়ে আনবার কথাটাই মনে হ'ল আমার, কণ্ঠস্বরটা সহজ করে নিয়ে যতটা সম্ভব সামলাবার চেষ্টা করে বললাম—“আশা করি সেরকম অবস্থা নয়, কিন্তু হোক আর নাই হোক, আমি ভিক্ষা হিসাবে কিছু দিতে পারব না বাপু ! যদি কাজ চাও, নিদেন কাজ শিখতে চাও তো চেষ্টা দেখতে পারি।”

“কাজ চাই বাবু। শিখতেও হবে না, জানি, সেই জন্যই এসেছিলাম।”

অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, যেন একটু সাহস পেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলও একটু মলিন হাসি।

প্রশ্ন করলাম—“কি কাজ জান ?”

“প্রেসের কাজ জানি, কম্পোজিটারের। আপনার প্রেস রয়েছে তাই এসেছিলাম।”

নিজেই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি, একদিনের অভিজ্ঞতায় হঠাৎ এরকম একটা ধারণা গড়ে বসেছিলাম কেন ?

বললাম—"বেশ, করো কাজ তাহলে, আমি ব'লে দিচ্ছি।"

ফোরম্যানকে ডেকে কাজ দেখিয়ে দিতে বলে দিলাম।

টেকে যেত, আমারও রাখবারই আগ্রহ, ওরও হাত বেশ পরিষ্কার!

কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, যেদিন মাইনে দিয়ে কাজটাতে পাকা করে দোব সেইদিনই ধরা পড়ে গেল—কাজের দিকে হাতটা যেমন পরিষ্কার, অন্যদিকে তেমনি হাত-সাফাইও আছে—টাইপ সরায়। হিসাব করে দেখা গেল প্রায় সমস্ত মাসটাই ঐ করছে—হয়তো বিশ্বাসটা জমিয়ে নিতে যে কটা দিন লেগেছিল সে কটা দিন বাদে। মাইনেটা দিয়ে বিদায় করে দিতে হল।

এর পরেরটি চুরির দিকে গেল না, পূর্বেরটি যে ঐ করে বিদায় হয়েছে এইটেই প্রতিষেধকের কাজ করে থাকবে, সবাই সাবধান ছিল, ওকেও সাবধান থাকতে হল।

কিন্তু হাত সাফাই-ই তো একমাত্র পন্থা নয়—এবিষয়ে যাদের প্রতিভা আছে তাদের সামনে। যেদিন মাইনে নিল তার পরদিন আর এল না—তার পরদিনও নয়। একটু সন্দেহ হতে আমি হোটেলে চলে গেলাম।

প্রথমটি পরিবার নিয়ে ছিল, বুড়ী মা, রুগ্না স্ত্রী, দুটি ছেলে—অর্থাৎ আমায় যা বলেছিল। এটি ছিল একা। পরিবার আছে তবে সঙ্গে নয়। একবার বলেছিল কালনায়, পরে বোধ হয় কালনায় আমার যাতায়াত আছে টের পেয়ে বলেছিল খুলনায়। সত্যাসত্য অত তলিয়ে দেখতে যাই নি—দুটিই বিশ্বাসযোগ্য, সুতরাং কোনটিই অবিশ্বাস করা দরকার মনে করি নি।

পরিবার সঙ্গে নেই, সুতরাং রাঁধার অসুবিধা। আমি মিশিরের হোটেলে নিজের দায়িত্বে মাসকাবারি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

গিয়ে জানতে পারলাম খোরাকির টাকা দিয়ে যায় নি। চল্লিশটি টাকা দণ্ড দিয়ে আসতে হল, রেট ত্রিশ টাকাই, মিশির বলল মাছটা 'ইসপিসিল্' নিয়ে খেতো, বলত, আমরা পূর্ববঙ্গের লোক, সাধারণ বরাদ্দ ছ'টুকরা মাছে ভাত ভুলতে পারি না।

অবসন্ন মনে ফিরছিলাম, রাগ নয় অবসাদই, স্বাধীনতা তো এল, কিন্তু কারা সে স্বাধীনতা ভোগ করবে? একদল ভুলের মাশুল দিতে দিতে বিপর্যস্ত, এগুবে বা এগিয়ে নিয়ে যাবে তার পথ কোথায়? আর একদল—মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগ গেছে, সুতরাং দেশের সঙ্গে, সুতরাং যুগ যুগ ধরে দেশের সঞ্চিত নীতির সঙ্গেও—পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বাঙালী-ভারতের নাম করতে হলে যে তিনটে জাতের নাম পেছনে করা চলত না, তাদের আধাআধি—মানুষের স্তর থেকে দিন দিনই নেমে গিয়ে কোথায় যে তলিয়ে যাচ্ছে!

আমার চিন্তারও তল পাচ্ছি না কোন, এই সময় ছেলেটি এসে সামনে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল—"চীনাবাদাম নেবেন বাবু?"

সামনে এসে দাঁড়ানোয় আমায়ও দাঁড়িয়ে পড়তে হল, বললাম—"না"।

কাঁধে একটা ঝোলা টাঙানো; হাতে একটা কাগজের ঠোঙা, সেইটে বাড়িয়ে ধরে মিনতি করল—"হ্যাঁ, একটা নিন।"

উদ্বাস্তুই, তবে এবার একটি শিখ বাচ্চা। বয়স বছর আটেক হবে, চুলটা মাথার ওপর বিড়ের মত করে জড়ো করা, গৌরবর্ণ মুখটা পরিশ্রমে এবং রোদে রাঙা হয়ে উঠেছে।

একটু অসন্তোষের ভাব দেখিয়েই বললাম—"না, না; পথ ছাড়ো, আমি চীনাবাদাম নিয়ে কি করব?"

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম।

নেওয়া যেত একটি ঠোঙা, কিন্তু কেমন একটা অবসাদ এসেছে

মনে, এদের সংস্পর্শে আর আসতে ইচ্ছে করছে না, সাহস হচ্ছে না বলাই ঠিক, এরা তো পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বাঙালী নয়, এরা এক জাত। সেই জাতের ছুটির অভিজ্ঞতায় মনটা অবসন্ন হয়ে আছে, এর ওপর সন্থ সন্থ আর একটির চলবে না। হয়তো দেখব একটা প্রবঞ্চনা করেছে—এই শিশু—দেবশিশুর মতোই দেখতে।···মানুষে বিশ্বাস একেবারেই ফেলব হারিয়ে।

ছেলেটি পাশে পাশে চলেছে—বাঁ হাতে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে—"নিন বাবু, আপনার বাচ্চারা খাবে। খোঁকি খাবে, খোঁকা খাবে। আমার একটা ঠোঙা বিক্রি হয়ে যাবে।"

একটু রাগই হয়ে আসছে শেষ পর্যন্ত দেখছি। পাশে ঐরকম শিশু অনুরোধ করতে করতে চলেছে, তুমি শুনছ না, এ দৃশ্যটাও তো রুচিকর নয়। একটা নিয়ে আপদ বিদায় করি।

নিয়ে, দাম দিয়ে একটু লোভ হল, হয়তো যে রাগটুকু জমে ছিল মনে তার জন্যই; প্রবঞ্চনাটুকু হাতে-নাতে ধরে দিয়ে একটা ধমক দিয়ে বিদায় করি, তাতে যতটুকু কাজ হয়। কাগজের ঠোঙাটা ছিঁড়ে হাতে চীনাবাদামগুলো ঢালতে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ ওর মুখের দিকে নজর পড়তে নিরস্ত হয়ে পড়তে হোল। সেই যে মিনতির ভাব সেটা কোথায় চলে গিয়ে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে দৃষ্টিতে, মুখটা গম্ভীর, বলল—"বোধ হয় তুমি মনে করেছ ঠকাচ্ছি, ঢালো, ঢালো না।"

শিশুর আদেশে চালিত হয়েই যেন সবগুলো ঢেলে ফেললাম হাতে। লজ্জিত হয়ে পড়েছি, প্রত্যেকটি বাছা, ভালো করে ভাজা, একটি কাঁচা, কি পোড়া, কি পোকায়-ধরা নেই।

মুখের দিকে চেয়ে বলল—"প্রত্যেক ঠোঙায় চারটে করে কম আছে ওরা যা দেয় তার চেয়ে, কিন্তু খারাপ দেব কেন?"

লজ্জাটা ঢাকতে হবে, তা ভিন্ন মুগ্ধও করে দিয়েছে বৈকি—রূপে, ভঙ্গিতে, তার ওপর অত অন্ধকারের মধ্যে এই একটি মাত্র আলোক-রশ্মি, বললাম—"তাই দেখছিলাম, ভালো সবগুলিই।···তোমরা পাঞ্জাব থেকে এসেছ না ?"

সহানুভূতিতে মুখের ভাবটা বদলে গেছে, বলল—"হ্যাঁ।" তার পর করুণ ইতিহাসটারও কিছু কিছু বলল।

প্রশ্ন করলাম—"এখানে এসে তোমরা সবাই করছ কি ?"

"বাবা কাপড় ফিরি করে বেড়ায়, মা বড়ি আর পাঁপর তোয়েব করে, আমার বড় ভাই—আমার চেয়ে তিন বছরের বড়—সেগুলো বিক্রি করে ঘুরে ঘুরে। আমার চেয়ে যে ছোট—একবছরের ছোট—সে ন্যাবাঞ্চুস বিক্রি করে। মা বলে বোনটা থাকলে মা আরও বেশী তোয়ের করতে পারত বড়ি আর পাঁপর—সেই সব চেয়ে বড় ছিল কিনা।···"

বুকটা হঠাৎ অসহ্য মোচড় দিয়ে উঠল।···দেশনায়কদের সেই পাহাড়ে ভুলের পাহাড়ে ট্রাজেডি।

এগিয়ে চলেছি। পাশে পাশেই চলেছে গল্প করতে করতে, তার মধ্যে এক-একবার ছুটকে যাচ্ছে, সওদা বিক্রির জন্যে—কোথাও হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। গল্প চলছে বলে ফিরে ফিরে আবার পাশে পাশে আসছে আমার। বেশ ভাবও হয়ে গেছে।

কিছু করা যায় না ? তার পর হঠাৎ খেয়ালটা উদয় হোল মাথায়। বললাম—"দেখি তোমার ঝোলাটা।"

হাতে তুলে দিল।

"কত মাল আছে তোমার এর মধ্যে ?"

একটু হিসাব করে নিয়ে বলল—"পঁচিশটা ছিল, দশটা বেচেছি, আর পনেরটা আছে।"

"সবগুলোর এক আনা করে দাম ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পনের আনা। ঝোলাটা কত দিয়ে কিনেছিলে ?"

"আট আনা দিয়ে।"

"তা হলে সব মিলিয়ে হল এক টাকা সাত আনা। আমি তোমায় পুরোপুরি দুটো টাকা দিচ্ছি, দাও আমায়।"

শুনতে শুনতে ওর মুখের ভাবটা বদলে আসছিল। খপ ক'রে হাতটা বাড়িয়ে মুখের দিকে চাইল। প্রবঞ্চনা ধরতে গিয়ে সে যা চেহারা দেখেছিলাম তার চেয়েও দীপ্ত, এই সময় রাস্তার গাছের ফাঁকে খানিকটা রোদ এসে পড়ায় আরও দীপ্ত দেখাচ্ছে। তার পর সেই ভাষা এখনও কানে লেগে রয়েছে—অনুবাদ হবার নয় বলে ওর মুখের কথাই দিচ্ছি তুলে।

দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির দৃষ্টি আমার মুখের ওপর তুলে বলল—"ম্যয় মেহেরবানি কী বোটি নেই খাতা, মেহনৎ কী রোটি খাতা, বাবুজী।"

হাতটা আমার আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, ঝোলাটা নিয়ে গট গট করে বেরিয়ে পড়ল।

আমার দুটো অভিজ্ঞতার গ্লানি অনেকখানি গেছে মুছে। সিন্ধী, বাঙালী পাঞ্জাবী যাই হোক, ওরা এক জাত, ওরা বাস্তুহারা, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে—অন্ধকার বাড়িয়ে। ভাবছিলাম একটু ক্ষীণ আলোকও যদি পেতাম দেখতে।

তা পেয়ে গেছি।

বিশ্বাস

"ঘেরেঘুরে তো নাছোড়বান্দা হয়ে বসিস, কিন্তু তোদের কাছে গল্প করে সুখ নেই, শুধু হাস্যাস্পদ হওয়া। তোরা ভূতে বিশ্বাস করবি না, ওঝায় বিশ্বাস করবি না, সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস করবি না, দৈবে বিশ্বাস করবি না,—বিশ্বাস করব না, এ যুগের তোদের হয়েছে একটা জিদ; নোট বুক থেকে সায়েন্স আর কিসের গোটাকতক বুকনি মুখস্থ ক'রে…"

মুটু আপত্তি করল—"যুগ টেনে কথা বলেন, ঐটে গায়ে লাগে দাদু। তাহলে আমায়ও বলতে দিন—আপনাদের যুগে ছিল সব কিছুতেই চোখ বুজে বিশ্বাস করবার একটা জিদ, ভূতে-ওঝায়-সাধুতে-অসাধুতে, সম্বল—শাস্ত্রের গোটা কতক বাঁধা বুলি…"

শিবকালী মুখটা ঘুরিয়ে একটু আড়ে চেয়ে পা দুটো নামিয়ে চটিতে সাঁদ করাতে যাচ্ছিলেন, সবাই চেপে ধরল; মুটুও সামলে নিয়ে বলল—"সবটুকু বলতে দিন আমায়, রেগে উঠলেন!… বলছিলুম, আপনাদের বিশ্বাস আর আমাদের অবিশ্বাস এই দুটো বাদ দিয়ে দিন হাতে তো ফাঁকা জিদটুকু ছাড়া দু পক্ষেরই কিছুই রইল না।"

হরেন বিড়ির বাণ্ডিল এনে সামনে রেখে দেশলাই জ্বালাল, শিবকালী একটা বিড়ি টেনে দাঁতে চেপে মুটুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"বিশ্বাসের তোরা কি দেখেছিস যে…"

সবাই কথা জড়াজড়ি করে বলে উঠল—"কিছু দেখি নি দাদু—ওটার কথা ছেড়ে দিন, ওজে আরও দেখে নি—দেখি নি বলেই তো

এই অবস্থা—বিশ্বাস কী নিয়ে দানা বাঁধবে বলুন না। আপনি বলুন দাদু—শুনলেও যদি মতিগতি বদলায়…"

কাঠিটা নিবে গিয়েছিল, শিবকালী হরেনের হাতে থেকে বাক্সটা নিয়ে আবার একটা জ্বেলে বিড়িটা ধরালেন, ফিরিয়ে দিয়ে এক টান টেনে বললেন –"এই জিদই হোল বিশ্বাস, বিশ্বাসের তো একটা করে ল্যাজ গজায় না। আমি এই জিনিসটা ধ্রুব সত্য বলে জেনেছি, এইতেই শেষ পর্যন্ত আমার মঙ্গল, সুতরাং তোমরা যত যাই করো এর থেকে আমি এক চুল নড়ছি নে—এই হচ্ছে বিশ্বাসের গোড়ার কথা…"

"তাহলে দাদু " হুটু আবার উসখুস করে উঠছিল, শিবকালী হাত উঁচিয়ে বললেন—"আগে গল্পটা শোনো শেষ পর্যন্ত, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তখন তর্ক করো নাস্তিকের মতন। এমন কিছু বানিয়ে বলাও নয়। দীন বাচস্পতির নাতি-নাতনীরা এখনও বেঁচে রয়েছে, একদিন গঙ্গাটুকু পেরিয়ে ওপার থেকে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে এসো বরং।

"যখনকার কথা বলছি সে সময় ওঁর মতন পণ্ডিত এ তল্লাটে ছিল না। বাংলারও চেহারা তখন অন্য রকম। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী, বড়লাটের আড্ডা, সারা ভারত বাংলায় এসে মাথা নোয়াচ্ছে। তার মধ্যে একদিকে রয়েছে যত রাজা-রাজড়া,—মাইশোর থেকে নিয়ে কাশ্মীর, তার মাঝে রাজপুতানার ছোট বড় যতগুলি। বিদ্যেবুদ্ধি, প্রতিপত্তি ধনদৌলত—বাংলার বোলবোলাও তখন দেখে কে?

"সবাই এসে এইখানে জড়ো হচ্ছে, এতে একটা সুবিধে এই হোত যে নাম কেনবার জন্যে বাংলার ছেলেকে বাইরে গিয়ে দরবার করতে

হোত না। বাঙালীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে সবাই হা-পিত্যেশ করে থাকত, অবিশ্যি শিবকালীর সঙ্গেও নয়, মুটু বাগচির সঙ্গেও নয়, সম্পর্ক পাতাবার যুগ্যি এমন বাঙালীর সঙ্গে। এ-কান সে-কান হতে হতে বাচস্পতি মশাইয়ের কথাটা জয়পুরের কানে উঠল। মহারাজ সভাপণ্ডিত করে নিলেন। বাচস্পতি মশাই বললেন—তা কর, কিন্তু তুমি যে বলবে গঙ্গা ছেড়ে সেই মরুভূমির মধ্যে এসে বাস করো, সেটি পারব না বাপু। তাই হোল, রাজা যখন আসতেন, কলকাতা থেকে জুড়িগাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াত, বাচস্পতি মশাই দরবারী পোশাক পরে উঠতেন গিয়ে। রোজ নয়, যেদিন মহারাজের দরবার করবার ফুরসৎ বা ইচ্ছে হোত।

নির্লোভী গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনখানি মেটে ঘর, বাইরে একটি ছোট আটচালা, এইটুকু নিয়ে পৈতৃক ভদ্রাসন। আটচালাটিতে গুটি পাঁচেক ছাত্র নিয়ে একটি টোল বসিয়েছিলেন, এর বেশী ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মী ঢেলে দিলে আর করবেন কি করে? মেটে ঘর গিয়ে চকমেলানো বাড়ি উঠল, চণ্ডীমণ্ডপ, ওদিকে টোলের জন্যে আলাদা পাকা দালান—পুকুর, বাগান; সেই অনুপাতে কাজকর্মও, দোল-দুর্গোৎসব; বাচস্পতি বাড়ি, জমিদার বাড়ির জেল্লাকেও হার মানিয়ে দিলে।

টাকার সঙ্গে সঙ্গে সবই আস্তে আস্তে বদলালো; এমন কি তখনকার নতুন হাওয়ার কিছু কিছু দোষ, মানে তখনকার আধুনিকতা আর কি—তাও ঢুকল বাড়ির মধ্যে—অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের মধ্যে—সবই বদলালো, বদলালো না শুধু বেচারামের বিধবা পিসী। বেচা ছিল জাতে বাগদী। পুরনো জিনিস সবই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল—যা সব নাকি চকমেলানো বাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ, দোল-দুর্গোৎসব,

নতুন স্টাইল—এসবের সঙ্গে মানায় না—কিন্তু বেচারামের পিসীকে কোন মতেই ছাড়লেন না বাচস্পতি মশাই·

সবাই হাঁ করে চেয়েছিল, হারান বলল—"অত বড় জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত হয়েও দাদু?"

"এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানবুদ্ধি কি কিছু কাজে আসে ভাই? ও যেমন তোমার দীন বাচস্পতি তেমনি তোমার কিনু গোপ, কি হীরু পরামানিক। বেচুর পিসীকে কোনমতেই ছাড়লেন না বাচস্পতি মশাই। এমন কি—অবিশ্যি শোনা কথা, সব তো আর চোখে দেখি নি,—রাজার ছেলে না নাতির বিয়েতে একবার নাকি জয়পুরে যেতে হয়েছিল বাচস্পতি মশাইকে. সেই একবার কটা দিনের জন্যে গঙ্গা ছেড়েছিলেন—তা সেখানেও নাকি বেচারামের পিসীকে পুরুষের বেশে সাজিয়ে "

হুটু মুখটা একটু সিঁটকে বলল—"আর গঙ্গার দেশে না ফেরাই উচিত ছিল তাঁর ; এতই যদি "

খিঁচিয়ে উঠল হারান—"আচ্ছা, রোমান্সটুকু ঠিক যেখানে জমে আসছে সেইখানটিতে এমনি করে ঢুকে না দিলে তোর চলে না?· এখান থেকে জয়পুর দাদু, সে তো চাড্ডিখানি কথা নয়—এরোপ্লেনের যুগ নয় যে সাজিয়ে-গুজিয়ে, টুপ করে তুললাম, ঘণ্টা কয়েক সবার চোখে ধুলো দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার যে বেচারামের পিসী সেই বেচারামের পিসী। রেলে, তাও তখনকার রেল—খিকির খিকির করতে করতে· "

"রেলই বা তখন অত দূর কোথায় রে বাপু? দিল্লী পর্যন্তও পৌঁছোয় নি বোধ হয়, তার পরই উট ভরসা। একবার যেতে হলে কম করেও বোধ হয় দিন পনেরর ধাক্কা। তবে কথা হচ্ছে, [illegible]

পিসীকে একবার দুখীরামের মেসো করে সাজিয়ে দিলে ও দু' হপ্তা কেন বছরখানেক ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে থেকেও চিনে ফেলবেন এমন মরদ তো আজ পর্যন্ত জন্মাল না। রংটা আমার গায়ে আর এক পোঁচ চড়ালে যেমন হয়। টিয়ে পাখির মতন টিকলো নাক, চোখদুটো গর্তের মধ্যে যেন জ্বলছে। এদিকে ছ ফুটের জোয়ান, যখনকার কথা তখন বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি; কিন্তু একটু ঝোঁকে নি, সিধে যেন বাঁশের লাঠিটি, গলার আওয়াজ ছিল যেন···"

সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে, হারান একটু ব্যাজার হয়েই বলল—"থাক, ও তো বুঝলুম দাদু; নিয়ে গিয়েছিলেন কি করতে? অস্পৃশ্যও তো। যে যুগের কথা বলছি···"

"নিয়ে গিয়েছিলেন ওর টোটকার জন্যে। তখন তোদের এখনকার মতন নাস্তিকতায় তো ছেয়ে যায় নি দেশটা, ওদিকে খনার বচন আর এদিকে টোটকা এই দুটো নিয়ে চলছে। গাঁয়ের বুড়ী মাত্রেই টোটকায় এক-এক জন খালিফা, তার মধ্যে বেচারামের পিসী ছিল সবার উপরে। তার কারণ ছিল, টোটকার মোটামুটি ফরমুলাগুলো অনেকেই জানত, কিন্তু ওর-মতন অমাবস্যের রাতে এলো চুলে গেরো দিয়ে মাঝ-শ্মশান থেকে গাছগাছড়া আনবে কে? সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি—আজকাল বড় বড় ওষুধগুলোর ফরমুলা তো বাজারে ছেড়ে দিয়েছে, সব কোম্পানিই করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে তারতম্য আছে তো? বেচারামের পিসী ছিল পার্ক্ ডেভিস্।

"এর থেকে তোরা যেন মনে করে বসিস নি যে বাচস্পতি মশাই নিত্যি রোগ নিয়ে পড়ে থাকতেন। তোদের এ যুগে বড় বড় ওষুধের কোম্পানিগুলো চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপন দিয়ে নিত্যি তোদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে A থেকে Z পর্যন্ত ভাইটামিনের কোন্ কোন্ গুণের

ঘাটতি হয়েছে খুঁজে দেখ, নয়তো গেলি—তাইতেই তোরা নিত্যি একটা না একটা কিছু নিয়ে পড়ে আছিস ; সে যুগে ওঁদের অত করে শোনাচ্ছেই বা কে, শোনবার ফুরসৎই বা কোথায় ? ভোরে গঙ্গাস্নান, আহ্নিক পূজো, টোল, তার পর শাস্ত্র-আলোচনা—কটা ভাইটামিন আছে তার খোঁজ রাখবার সময় কোথায় যে তার মধ্যে কটার ঘাটতি হয়েছে তার হিসেব রাখবেন ? নীরোগ নির্বিরোধী মানুষ, কচিৎ কখনও সর্দি বা মাথাটা একটু টিপটিপ করল, কি, বয়স হয়েছে, দাঁতের গোড়াটা একটু কন কন করে উঠল, ব্যস্। ইচ্ছে হোল, বেচুর পিসীর কাছে থেকে একটা টোটকা আনিয়ে নিলেন, গঙ্গার জল ছিটিয়ে খেয়ে নিলেন ; সারবার হোল সারল, না, কিছু ভোগ আছে, সেটুকু কেটে গেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বাড়িতে কবিরাজের যাওয়া-আসা ছিলই—যেমন সব বাড়িতেই ছিল সেকালে ; তার পর লক্ষ্মীর কৃপা হতে পাশ-করা এলোপ্যাথ আর নাম-করা হোমিওপ্যাথের আমদানিও হতে লাগল, যুগটা আস্তে আস্তে পালটাচ্ছে তো, কিন্তু ঐ ওঁর ঘরের চৌকাঠের বাইরে পর্যন্ত। এই করে করে চলল, তার পর ঐ যা বললুম, বিশ্বাসের কথা। যে কখনও ভোগে নি, সে যখন পড়ে মনে হয় না তো আর কখনও উঠবে ; বাচস্পতি মশাইয়েরও তাই হোল, একেবারে যাকে বলে হাত-পা মুড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

"এ যখনকার কথা বলছি তখন ওঁর বয়স একাত্তর পেরিয়ে গেছে, এই সময় একটা ফাঁড়া ছিল কুষ্ঠিতে, এইটে পেরিয়ে গেলে আবার বছর দশেক বাঁচবেন।

"বাচস্পতি মশাই অসুখে পড়েছেন, কথাটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, তা থেকে সমস্ত গ্রাম, তা থেকে সমস্ত তল্লাটটায়। যাওয়া-আসা,

খোঁজ-খবর নেওয়া, এটা করো ওটা করো—নানান রকম চিকিৎসার পরামর্শ, রীতিমত একটা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু পরামর্শ নিচ্ছে কে? এখনি যেমন বললুম—ডাক্তারের রেওয়াজ তখন বেশ চলে গেছে দেশে, অভাবও নেই, সেরামপুরে তখন নীলমণি লাহিড়ীর বোলবোলাও, গঙ্গার এপার-ওপার পসার জমিয়ে বসেছেন। হালিসহরে রয়েছেন নিখিল পাল, খোদ প্রতাপ মজুমদারের হাতে গড়া হোমিওপ্যাথ—বাড়িতে ডাকলে ষোল টাকা ফি—তখনকার যুগে; কিন্তু না ডাকলে তো গায়ে পড়ে চিকিৎসা করতে পারেন না। তা ডাকছে কে? রুগীর কাছে কথা তুললেই শুধু বেচুর পিসী আর বেচুর পিসী।

"বেচুর পিসীর বয়স তখন তিরাশি চলছে। এর মধ্যে বেচারাম গেছে মারা, তাতে শরীরটা আরও কাবু করে দিয়েছে। একটা খাটুলি করে চারজন লোক নিয়ে এসে দরজার কাছটিতে রকে বসিয়ে দেয়। সব স্বকর্ণে শোনে, আবার খাটুলি করে চলে যায়···

"আর টোটকা···দিয়ে যাচ্ছে?" একটু অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল গোবিন্দ।

শিবকালী বললেন—"বাপুহে, একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক তুলেছিলে, সেই বিশ্বাসের গল্প বলছি আমি, সবচেয়ে আশ্চর্য যেটা জানা আছে। অসুখ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে টোটকা পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠছে বেচুর পিসীর হাতেই হোক, শেমোর মাসীর হাতেই হোক, এরকম তো আখছারই হোত. কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বাসের এমন কি আছে? দীন বাচস্পতি অসুখে পড়লেন নবমীর দিন। বেচারামের পিসীকে তখনই আনানো হোল। দেখে শুনে বললে—বেঁকা অসুখ, বাসি ওষুধে তো কাজ হবে না, অমাবস্যায় গিয়ে টাটকা ওষুধ তুলে নিয়ে আসতে হবে।"

"গিন্নীরা জিজ্ঞেস করলে—'হ্যাঁগা, ততদিন টিকবে তো রুগী, বেচুর পিসী ?'

"বয়েসও হয়েছে, তার ওপর বেচুটা গিয়ে এদানি খিটখিটে হয়ে পড়েছিল বুড়ী, মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—'তাহলে ছ্যাও তুলে ডাক্তার-বদ্যির হাতে বাপু, ট্যাকার তো অভাব নেই, আমি যা তা দিয়ে জেনেশুনে তো মেরে ফেলতে পারি না মানুষটাকে।'

"বাচস্পতি মশাইকে বলতে তিনি আরও চটে গেলেন—কেন ওসব কথা বলা হয়েছিল ওকে ? সবাই যখন জানে উনি বেচুর পিসীর ভিন্ন অন্য কারুর ওষুধ মুখে দেবেন না—তা একটা অমাবস্যা গিয়ে যদি পরের অমাবস্যার জন্যেও সবুর করে থাকতে হয়।

"অসুখ শরীর, খিটিমিটিতে মাঝখান থেকে অসুখটা আরও বেড়েই যাচ্ছে। নবুমী থেকে দশুমী, দশুমী থেকে একাদশী দ্বাদশী,—অসুখ বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার-বদ্যি ধরায় কার সাধ্যি ? অত বড় মানুষটা বেঘোরে যাবে ? চারদিক থেকে যাঁরা প্রাচীন, বিজ্ঞ, যাঁদের কথা চলবে, সবাই এসে বোঝালেন—কিছু ফল হোল না—সেই অমাবস্যা আসবে, বেচুর পিসী টাটকা ওষুধ তুলে নিয়ে আসবে, তার পর।

আবার বিশ্বাস করবার লোকও তো আছে, দেশটা তখনও তো একেবারে নাস্তিক হয়ে যায় নি—তারা বললে—দেখই না একটু ধৈর্য ধরে, আগে তো এরকম আখছারই হোত, একালেই কেন আর হয় না—তা দেখই না বাচস্পতি মশায় কেমন করে একালের মুখে চুনকালিটা মাখিয়ে দেন।

"একটা হৈ হৈ পড়ে গেল বাচস্পতি মশাইয়ের অসুখ নিয়ে। ক্রমেই রোগ যাচ্ছে বেড়ে, তার পর রুগীর ঐ জিদ—জিদই বল, কি বিশ্বাসই বল—কারুর বুদ্ধি আর কাজ দিচ্ছে না, তখন ঐ অন্নদা

চৌধুরীই জমিদারী বুদ্ধি বাৎলালেন—মহারাজাকে খবর দাও, তিনি কোনও ব্যবস্থা করলে সেটা আর ঠেলতে পারবেন না, আর তিনি রাজোচিত ব্যবস্থা ছেড়ে কিছু টোটকার দিকে যেতে চাইবেন না।

"তাই করা হোল, বাচস্পতি মশাইয়ের জন্যে রাজপুত ঘোড়সওয়ার সমেত একটা জয়পুরী ঘোড়া দিয়েছিলেন মহারাজ, লোকটাকে কলকাতায় ছুটিয়ে দেওয়া হোল।

"লাট সাহেব তখন সিমলায়, কাজেই সব বড় বড় রাজারাজড়াও সেখানে। কলকাতার বাড়ির যে এজেন্ট, মহারাজকে সে জরুরী তার করে দিল, সেখান থেকে জরুরী তারেই হুকুম এল যা চিকিৎসা পণ্ডিত মশাই করাতে চান তাতে যতই খরচ হোক, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হোক।

"পণ্ডিত মশাই যে এদিকে বেচারামের পিসীকে ধরে বসে আছেন, এজেন্ট আর কি করে জানবে? ওদিকে সময়ও নেই, এদিকে এই জরুরী তার, রাজরাজড়ার কাণ্ড জানেই, এজেন্ট নিজে অত বাছাবাছির মধ্যে না গিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে করলে একটা ব্যবস্থা; তা উপযুক্ত ব্যবস্থাই বলতে হবে বৈকি।

"তার পরদিন দুপুরের একটু আগে জোয়ারের সঙ্গে খেয়াঘাটে কলকাতা থেকে তিনটে বজরা নৌকো এসে ভিড়ল—এক বজরা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, এক বজরা হোমিওপ্যাথ, এক বজরা কবিরাজ-হেজিপেঁজি নয়, সব নাম করা—সঙ্গে তাদের নিজের নিজের ওষুধপত্র, সাজ-সরঞ্জাম—একটা শোরগোল পড়ে গেল, এপার থেকে নৌকো করে সব ছুটল তামাশা দেখতে। কবরেজদের চণ্ডীমণ্ডপে তোলা হোল, অ্যালোপ্যাথদের টোলের দালানটায়, হোমিওপ্যাথরা

বললে আমরা অত রকমারি গন্ধর মধ্যে থাকতে পারব না, খেয়াঘাটের পাশেই তাদের তাঁবু তুলে দেওয়া হোল। তোদের মতন ফিচলেমি করবার লোকেরও তো অভাব ছিল না—কিছু একটা হুজুগ পেলে একদল ঐ করতেই থাকত, তারা বললে—অ্যালোপ্যাথ আর কবিরাজরা ঐ দিক থেকে ঠেলে দেবে—হোমিওরা খেয়া পার করবার জন্যে ঘাঁটি আগলে রইল।

"তা থাক, কিন্তু ওদের মানছে কে? বাচস্পতি মশাই তখন প্রায় বাকশক্তিহীন, কথাটা কানে তুলে দেওয়া হল। কোনরকমে ঠোঁট নেড়ে যেন কত দূর থেকে নিতান্ত মিহি আওয়াজে দুটি কথা বলতে পারলেন—'বেচারামের পিসী।'

"তখন ঐ অন্নদা চৌধুরীই কড়া হয়ে উঠলেন—এমন চরম অবস্থাতেও রোগীর মত নিতে হবে? শুরু করে দাও চিকিৎসা। বোধ হয় হোতই দেওয়া, কিন্তু তখন আবার সমস্যা দাঁড়াল—কোন্ চিকিৎসা—হোমিওপ্যাথ, কবরেজি না অ্যালোপ্যাথি? তোরা সব বিশ্বাস কবিস না, কিন্তু এইখানেই দেখে নে যেই ওপরওলার কারচুপিটা—একটা লোক দাঁতে দাঁত চেপে তার বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, যুঝল যেই তার ক্ষ্যামতা লোপ পাবে আর তার বিশ্বাসে ঘা দেবে? ঐ এজেন্টকে দিয়ে আগে থাকতেই তার পথ মেরে রাখলেন।

"এই সব মতামত গোলমালের মধ্যে রাতও হয়ে গেল, অমাবস্যা পড়ে গিয়েছিল বিকেলেই, অন্ধকারটা একটু জমাট হয়ে আসতেই বেচারামের পিসী ডুলি করে বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার ঘোষাল-গিন্নী সম্পর্কে ভাজ হন, এসে কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—'বাচপোত ঠাকুরপো, বেচুর পিসী বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ

বিশ্বাস নিয়ে রইলে এতগুলোর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, আর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ; সবাই দেখুক…'

"পড়েছেন পর্যন্ত এই প্রথম একটু হাসি ফুটল মুখে। হাতটাও কি বলবার ভঙ্গিতে যেন একটু তুললেন। ঘোষাল-গিন্নী, যারা ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন—'ঐ নাও।…আছি ধৈর্য ধরে, ভাবতে হবে না।'

"চৌধুরী-বাড়ির দেউড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বেচারামের পিসী এসে উপস্থিত হোল। তিরাশী বছরের বুড়ী, এদিকে ঝিমিয়েই থাকত, কিন্তু সে রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে সে কি চেহারা হয়েছে ! শণের নুড়ির মতন যে ক'গাছা চুল আছে মাথায়, সবগুলো এলো করা, চোখ দুটো জ্বলছে, নাকের ডগাটা যেন আরও ধারালো হয়ে চকচক করছে। থমথমে ভাব, কারুর সংগে কোন কথা নয়, শুধু ঘোষাল-গিন্নী যখন বললেন—'একটু ত্বরস্ত করে নাও বেচুর পিসী, রুগী এলিয়ে পড়েছে।'—তখন মুখটা একটু বেঁকিয়ে বললে—'এলিয়ে যাবে কোথায় শুনি ?' লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুটখুট করে দোরের কাছটিতে গিয়ে বসল। হামানদিস্তে, খল, গঙ্গাজল সব তোয়েরই ছিল—নিজেই ওষুধ ধুলে, বাছলে, কুটলে, তার পর খলে মধু দিয়ে গুলে বললে—'খাইয়ে দ্যাওগে।' সেই রকম খুটখুট করে ভুকতাকও ভুলিতে উঠে বললে—'তোল্।'…বাড়িতে গিয়ে কি সব নেমে এসে করত।

"ঘড়ি ধরে ঠিক মিনিট পনেরো, তার পরেই দেখতে দেখতে…

'সেরে উঠলেন দাদু ?' সবাই দমবন্ধ করে বসেছিল, এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

বাধা পেয়ে শিবকালী অবাক হয়ে সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে

নিলেন একটু, তার পর যেন বুঝতে পারছেন না এইভাবে বললেন—"তোরা কি রে! একাত্তর বছর বয়েস, তার ওপর কুষ্ঠীতে লেখা, একটা কঠিন ফাঁড়া যাচ্ছে, কলকাতার তা-বড়, তা-বড় ডাক্তার বঞ্চি ভিড় করে বসে রয়েছে, একবারটি ঘুরেও চাইলে না, কারুর দিকে—নেহাৎ কালে না ধরলে এসব দুর্মতি হয় কারুর? আবার জিজ্ঞেস করছিস—সেরে উঠলেন দাদু?...বিশ্বাস নিয়ে নাস্তিকের মতন তর্ক করছিলি, তার কি রকম দেখলি তাই বল্।"

ডায়েরীর পাতা

ট্রামটা হাইকোর্টে যাবে, বড়বাজার হয়ে।

এ-রুটের হাইকোর্টের ট্রামে ভিড় কমই থাকে, তায় দুপুর বেলা; কিন্তু ভিড় না থাকলেও প্রবেশ করে দেখলাম সামনের দিকে একটু জটলা হচ্ছে—কয়েকজন ছোকরার মধ্যে। উঠেই সুমুখে বসবার জায়গা ছিল, কিন্তু জটলার স্বরূপটা একটু সংশয়জনক মনে হওয়ায় এগিয়ে গিয়ে একটা সীটে বসলাম। একেবারে আগে বাঁদিকের সীটে দুটি বাঙ্গালীর ছেলে উলটে পেছন ফিরে বসেছে, ঠিক তার এদিকেই, আর ডানদিকের সীটে জনচারেক, মনে হল মাড়োয়ারীর ছেলে; একটা বেশ জোরালো তর্ক চলেছে।

আমি যখন গিয়ে বসলাম তখন এদের গলাই জোর। ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, তার ওপর আবার পুরানো ঝরঝরে ট্রাম, কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন ওদের দুজনকে কোণ-ঠাসা ক'রে এনেছে খানিকটা। এই সময় আমি গিয়ে বসতে ওদের দুজনের একজন আমার মুখের দিকে চেয়ে সঙ্গীর কানে ফিস ফিস ক'রে কি

যেন বলল। সঙ্গীটিও আমার মুখের দিকে চোখ তুলে একটু চাইল, তার পরেই তার ধরণ-ধারণ গেল বদলে, আমার দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে ওদের দিকে মুখ করে মুখটা খিঁচিয়েই বলল—"যা যা, বাংলা পড়বে, তাও আবার রবীন্দ্রনাথ! জন্ম পালটে আয়!"

ব্যাপারটা কতক কতক বুঝলাম; হঠাৎ এত জোর কোথা থেকে এল সেটাও আন্দাজ করতে বেগ পেতে হল না। ভাষার বড়াই। প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্যের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক গলাবাজিতে এঁটে উঠতে পারছিল না, তার পর—একজন লেখককে কাছে পেয়ে (যেমন বোধ হল, চেনে আমায়)—তেড়েফুঁড়ে উঠেছে।

তর্ক চলছে নিজের নিজের ভাষাতেই।

ওদিক থেকে উত্তর হল, অবশ্য ব্যঙ্গের সুরে—"তোমাদের খাস রবীন্দ্রনাথ তো তাঁকে সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখলেই পার; তাঁকে, মানে এখন তাঁর বইগুলোকে।"

প্রত্যুত্তর হল ঐ সুরেই—"অত না হ'লে বুদ্ধি! (ব্যবসা নিয়ে একটা বক্রোক্তি করল) রবীন্দ্রনাথকে সিন্দুকে পোরা মানে সূর্যকে সিন্দুকে পোরা, পার তো দেখো না চেষ্টা করে।"

সঙ্গী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে টিপ্পনি করল—"না হয় পবন-নন্দনের মতন বগলদাবা..."

ব্যাপারটা আন্দাজ করা পর্যন্তই আমার বিরক্তি লাগছিল, তবে দখল দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না; তর্কটা আবার বিপদমুখো হয়ে দেখে আর চুপ করে থাকা ঠিক মনে হল না, নিম্নস্বরের মন্তব্যটাও চাপা দেওয়া দরকার, দেখলাম অস্পষ্ট হলেও দু'একজনের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি ছেলে দুটির দিকে চেয়ে বললাম—"যখন স্বীকার করছ পারা যাবে না সূর্যকে সিন্দুকে পুরে রাখতে তখন

আলো ছড়িয়ে পড়লে আর রোখবার উপায় কি ?—আর, আমাদের নিজেদের খাস দখলের জিনিস বলে সে আলোর পেছনে পেছনে ছুটবেই বা কতদূর, আর কত দিকে ?”

—নরম করেই নেব মনে করেছিলাম, কিন্তু বলতে বলতে যেমন ভেতরের উষ্মায় অনেকখানি বেরিয়েও গেল মুখ দিয়ে, তেমনি কণ্ঠ-স্বরটাও তিক্ত হয়ে উঠল।

দু'জনের মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—যেন Thou too Brutus !—তোমার ভরসাতেই না তোড়জোড় ক'রে আবার লাগতে যাচ্ছিলাম !

এরাও আমার মুখের দিকে চাইল তবে অন্য ভাবে। হয় তো কথাগুলা শব্দ ধরে ধরে বুঝল না, তবু বাংলাদেশের মাড়োয়ারী, এটা বুঝতে বাকি রইল না যে চোটটা উল্টো দিকেই পড়েছে। উৎসাহ পেয়ে অনুযোগের সঙ্গেই কি একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগে ওদের দুজনের যে অগ্রণী সে-ই অনুযোগ করল—“দেখুন না, পড়বে রবীন্দ্রনাথ ! এদিকে কথা কইবে তাতেও বাংলা উচ্চারণ শুনলে লোকে হাসবে কি কাঁদবে · ···”

বাধা দিয়ে, প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই শিউরে উঠে বললাম—“মাত্র উচ্চারণ নিয়ে তোমাদের ঝগড়া ! আমি ভাবলাম—বুঝি রবীন্দ্রনাথের কদর্থ করছে,—আমরা—অনেক বাঙালীরা যেমন করি—তাঁকে বুঝতে না পেরে।” আঘাতটা একেবারে কশাঘাত ; দুজনেই মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। আমি এখানেই শেষ হতে দিলাম না ; প্রশ্ন করলাম—“তোমরা পড় ?—মানে, ছাত্র ?”

“হ্যাঁ।”

"কি পড় ?"

"থার্ড-ইয়ার। এ বি. এস. সি, আমি বি. এ।"

"তাহলে তো ইংরিজী পড়তে হয়েছে বেশ খানিকটা। বেশ, এর পর আমরা এস ইংরিজীতেই কথা কই। উচ্চারণ সম্বন্ধে বেশ আত্মবিশ্বাস যদি না থাকে তো থাক্ কিন্তু।…What college or colleges do you belong to ?

অগ্রণীটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল। অপরটি একটু বেশি স্পষ্ট করেই বলল কলেজের নামটা। একটা মিশনারি কলেজ।

আমি ইংরাজীটা চালাবার জন্যই প্রশ্ন করলাম—"Why did you elect to go there to the exclusion of native colleges ?

পরীক্ষাটা কি রকম দিত জানি না, তবে সঙ্গী হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে বলে উঠল—"ওরে পেরিয়ে গেল যে, ওঠ্।"

উঠেও দাঁড়িয়েছে। এ বলল—"তুৎ, এ তো চিৎপুর গেল—ক্রস স্ট্রীট এখনও…"

সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বলল—"ও, হ্যাঁ, তাইতো দেখছি, ওঠ্।"

ইচ্ছা ছিল এরপর স্বয়ং কবিগুরুর প্রসঙ্গই এনে ফেলব, জ্ঞান যে এদের কত গভীর তা প্রায় জানাই তো ; কিন্তু যাদের এমন অবস্থা যে চিৎপুর রোড আর ক্রসস্ট্রীটের প্রভেদ ভুলে গেছে—তা সে ইচ্ছা করেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক—তাদের পিছু ডাকতে আর মন চাইল না ; ডাকলে ফল কি হত সে কথা আলাদা। সিঁড়ির কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে ওরা চলন্ত ট্রাম থেকেই নেমে গেল।

আমার নামবার কথা ছিল চিৎপুরে, কিন্তু আর একটু কাজ বাকি ছিল। ওদের প্রশ্ন করলাম—"তোমরা কি সবাই বাংলা পড়ো ?"

একজন মুখপাত্র হয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই উত্তর করল—"আমরা পোড়ে না, সাগরমল পোড়ে।···এই। একেই ঠঁ-ট্টা করছিল।"

সবচেয়ে লাজুক একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিল। তার পর আবার বলল—"ও খুব পড়িয়েছে, আমাদের বেয়ান দেয়, থাঁইস হোয় পড়ি, লেকিন ”

কথাটা হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে একটু লজ্জিত ভাবে হেসে উৎসাহের সঙ্গেই বলল—"এবার পড়ব ; আলবৎ পড়ব।"

ঘুরে বাইরে দিকে চেয়ে সঙ্গীদেব বলল—এবার মাড়োয়ারী বুলিতেই—"ওঠ, এসে গেছে।"

তিনজনে উঠল ; লাজুক ছেলেটি বসেই রইল, ওর কাছে বিদায় নিয়ে এবা নেমে গেল।

আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটি বলল—"একটা কথা···"

বসে পড়তে মুখের দিকে চেয়ে বলল—"আমার লাইব্রেরীতে আসবেন ? গুরুদেবের সব বই আছে। ·এই আমাদের কার্ড।"

শ্রদ্ধাব সঙ্গে লজ্জা মিশে মুখখানি অপূর্ব দেখাচ্ছে। বাংলাটাও পরিষ্কাব ; একটু কোথাও কোথাও বেঁকে গিয়ে আরও যেন মিষ্টি। কার্ডটা নিয়ে, পিঠে হাত দিয়ে বললাম—"নিশ্চয় আসব, শীগ্‌গিরই আসব। গুরুদেবের লাইব্রেবী—সে তো তীর্থ, আসব না ?···এখন চিৎপুরে একটু দরকারী কাজ আছে, তোমাদের টানেই এগিয়ে এসেছি।"

সিঁড়ির কাছে এসে আর একবার সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় ক'রে নেমে পড়লাম।

ভীমসেন

হঠাৎ স্ক্রীন পড়ে থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের ভেতরে একটা চাপা গোলযোগ, কিছু একটা ভুল-ত্রুটি হলে, কিংবা বিপদ-আপদ ঘটলে শ্রোতাদের কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা ক'রে যেমন হয়, সামলে নেওয়ার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। এর পরেই গোলমালটা বেড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পশুপতির বছর আষ্টেকের ভাইপোটা স্ক্রীন ঠেলেই স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়ল, তার পব "মামা শেষ!"— বলে খবরটা অডিটোরিয়ামে চারিয়ে দিযে, বোধ হয় সবার আগে বুড়ী ঠাকুমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছুটল।

প্লে হচ্ছে 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গ'। শরৎকাল, আকাশে মেঘ জমে মাঝে মাঝে গুম-গুম ক'রে আওয়াজ হচ্ছিল, গালমন্দ দিয়ে দুর্যোধনকে দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে টেনে তুলে ভীম একচোট মল্লযুদ্ধ করল তার সঙ্গে, তার পর শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে গদাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে কড়-মড়-কড়-মড় ক'রে বাজের আওয়াজ। আমরা বিস্মিত হয়ে এইটুকু দেখলাম যে, উরুতে তুলোর গদার চোট খেয়ে কোথায় দুর্যোধন কাৎ হবে, তার জায়গায় ভীমসেন যেন আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল। শুনেছি পার্টির মধ্যে কেউ কেউ নেশা-ভাঙ করে; ভাবছি, তারই ঝোঁকে পার্ট ওলটপালট করে ফেললে নাকি, এমন সময় পশুপতির ভাইপোটা ঐরকম করে বেরিয়ে এল।

একটা ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অডিটোরিয়ামে; অনেকের সঙ্গে আমিও স্ক্রীন ঠেলে সামনে দিয়েই স্টেজে উঠে গেলাম।

বললাম—"আগে ফুটলাইটের সুইচটা তুলে দাও, নৈলে ভিড়ে কারুর পায়ে তারটা ছিঁড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড হবে।"

হ্রদ দেখাবার জন্য স্টেজের একেবারে শেষের দিকে এ দৃশ্যটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, গিয়ে দেখলাম যে বাথ-টবটাকে দ্বৈপায়ন হ্রদ করা হয়েছিল, পশুপতি ভীমসেনের সাজগোজ প'রে তার পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আমি যেতেই কয়েকজন ভলেন্টিয়ার আর থিয়েটারের সাজগোজ-পরাও কয়েকজন ছেলে আমায় ঘিরে ফেলে বলল—"বীরেব মৃত্যু স্যার, সামরিক কায়দায় শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি,··ব্যাণ্ড নিয়ে আসতে গেছে···একটা ভালো খাটুলিও—যদি পেয়ে যায় কপাল জোরে ··"

একটু ধমকের টোনেই বললুম—"আগে দেখো, স্টেজে যেন ভিড় না হয়—কাউকে ঢুকতে দেবে না, বাজে লোক বের ক'রে দাও। ···ডাক্তারদের কেউ প্লে দেখতে আসে নি?"

"চাবিদিকে ফ্লু স্যার, সব এনগেজ্ড। কেউ আসেন নি।"

"দু-তিন জন ছুটে যাও, যাকে পাও ডেকে নিয়ে এসো; যেখানে পাও।"

ফ্লুর উল্লেখে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল, খুবই তো কাহিল করে দিচ্ছে, প্রশ্ন করলাম—"পশুপতির ফ্লু হয়েছিল না কি এদিকে?"

সামরিক কায়দায় শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার বাধা পেয়ে ওরা নিরাশ হয়েছে, একজন বলল—"ফ্লু'তে মরবে স্যার, যার এরকম মৃত্যু লেখা?"

"গদাঘাত করতে গিয়ে নিজে উলটে প'ড়ে!···" অনুচিত হলেও ওদের ওপরই রাগে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর একবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যেতে বলে এগিয়ে গেলাম, ততক্ষণে ভিড়টা আরও চাপ বেঁধে উঠে পশুপতিকে আড়াল ক'রে ফেলেছে।

একটু পথ ক'রে দিল সবাই। ভেতরে গিয়ে দেখি পশুপতি সেইরকম হাত-পা ছড়িয়েই পড়ে আছে। লাসটা ভীমের মতোই, কিন্তু কোনও সাড় নেই। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলোচনাই করছে সম্ভব অসম্ভব, একজন শুধু মাথায় মুখে জলের ছাট দিচ্ছে—আর মাঝে মাঝে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সাড়া নিচ্ছে—"পশুপতি !—ভাই !—পোশোরে ! কথা ক' !···"

—গলাটা একটু ভিজে-ভিজেই।

একটু ধমক দিতে হোল, বললাম—"কী হচ্ছে তোমাদের ? দেখছ দাঁত-কপাটি লেগেছে, পয়সা দিয়ে খোলবার চেষ্টা করো আগে, দেখি দাও তো একটা পয়সা কার কাছে আছে···"

"ও এখন মোহর দিলেও খুলবে না স্যার···", বিষণ্ণ কণ্ঠে কে একজন পেছন থেকে বলল।

বললাম—"আর ভিড় সরাও তোমরা আগে··একটা পাখা যোগাড় হয় না ?···আর পোশাকটা খুলে ফেলো, গায়ে হাওয়া লাগুক···"

কেন যেন ইতস্তত করছে।···বোধ হয় সেই ভলেন্‌টিয়ারটা পাশেই কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, বলল—"হ্যাঁ, দাও না, আবার পরিয়ে দিলেই হবে তখন।"

আমি নিজেই ব'সে পড়ে পোশাকটা খুলতে লাগলুম, দু তিনজন সাহায্যও করল। খুলতে খুলতেই প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু কি ক'রে হঠাৎ হোল এমন ? দিব্যি তো অ্যাকটিং করছিল···"

"ঐ যে বাজ পড়ল ; শোনেন নি আপনি !"

"ভীমসেনের পার্ট নিয়েছেন, উনি তো যা-তা অস্ত্রে মরবেন না···"

—সেই বীররস-পুষ্ট ভলেন্‌টিয়ারটি নিশ্চয়। আমি এবার স্টেজের

ওপর চোখটা বুলিয়ে বললাম—"বজ্রপাত হয় নি, তাহলে স্টেজটা আগে যেতো—সে রকম আওয়াজও তো ছিল না। যাক্ ভয়ের কিছু নেই, ভিড়টা একটু পাতলা হোক আগে—তখন থেকে বলছি—ভলেন্-টিয়ারা করছে কি ?…"

ডাক্তার এসে উপস্থিত হোল ; দুজন। জহরবাবু প্রবীণ লোক, পাশে ব'সে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে চোখের পাতা উল্‌টে দেখলেন, প্রশ্ন করলেন—কতক্ষণ হয়েছে, কি বৃত্তান্ত ; একটা ঘষা পয়সাও যোগাড় হয়েছে, সেইটে দাঁতের মধ্যে গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আস্তে আস্তে, আমি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলুম। বেজায় গরম, উত্তেজনাও হয়েছে খানিকটা।

স্টেজের পেছনটা বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, কানাৎ দিয়ে ঘেরা, তবে ওপরে কিছু নেই। দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে জহরবাবুকে বললাম কথাটা—পশুপতিকে ওখানে নিয়ে গিয়ে শোয়ালে কেমন হয় ?

বললেন—চোয়াল আলগা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হয়েছে, আর একটু দেখে নিয়ে আসবেন। কারণটা জিজ্ঞেস করতে উনিও বললেন—না, বজ্রাঘাতের মতো কিছু নয়, কাঠের ওপর, পায়ে জুতোও রয়েছে—আর তাহলে স্টেজটা তো আগে যেতো· ·

বললেন—আশা করছেন মিনিট কয়েকের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠবে—অমন লাস, এত দেরি হচ্ছে কেন সেইটেই আশ্চর্য !

একটা চেয়ার আনিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরালাম। তার পর একটা কথা খেয়াল হোল ; যে ছেলেটি চেয়ার এনেছিল, উত্তরার পার্ট নিয়েছে, তাকেই বললাম—"যে দুর্যোধনের পার্ট বলছিল সে কোথায় বল দিকিন—কি ব্যাপারটা হোল সে হয়তো

কিছু হদিস দিতে পারে—যদি লাইটনিং শক্ হয় তো তারও একটু-আধটু লাগার কথা ; কোথায় সে ?”

সে বললে—“দুর্যোধনের পার্ট নিয়েছিল গোকুল স্যার। আপনার কাছে বলতে ইয়ে হয়, ওর একটু ‘ইয়ে’ দোষ আছে। তা যতক্ষণ ওদিক'কার পার্ট করছিল, আমরাও চোখে চোখে রেখেছিলাম, ও-ও একটু সামলে-সুমলে ছিল, এ সীনটায় তো শুধু মরে নিশ্চিন্দি হয়ে পড়ে থাকবার পার্ট, কখন্ খানিকটা টেনে নিয়ে ঢুকে পড়েছে। জিগ্যেস করা হয়েছিল ; কিছু বলে না, আপন মনেই বিড় বিড় ক'রে কি ব'কে যাচ্ছে। ঐ তো ব'সে রয়েছে ওখানে ; আনব ডেকে ? কিন্তু বৃথা স্যার।”

আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম। দু'হাঁটুর ওপর হাত দুটো রেখে উবু হয়ে ব'সে মাথা হেঁট ক'রে বিড় বিড় করে কি সব বকছিলই গোকুল, প্রথমটা উত্তরার ডাকে সাড় হোল না, তার পর আমার কথা বলতে একটু চেষ্টা ক'রে চোখে চাড়া দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম—“কিছু জানো কি হয়েছে ?”

বার দুই আর একটু বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হঠাৎ একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল, গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করল—“পোশোর কথা শুদোচ্ছেন।”

বললুম—“হ্যাঁ, হয়েছিল কি ? তুমি তো সঙ্গে ছিলে।”

একটু টলল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তার পর খানিকটা আক্রোশের টোনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—“পোশো আমায় ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাটা সেই গবেট দুর্যোধন পেয়েছে, না ? উরু ভেঙে সাবাড় করবে !···এসা উলটো প্যাঁচ ঝেড়েছি···”

বোঝা গেল। “তুমি বোসো”—বলে চেয়ারটায় এসে বসলাম।

একটা সিগরেট ধরিয়েছি, উত্তরা এসে একটু তফাত হয়ে দাঁড়াল। মেয়ের পার্ট নিয়ে নিয়ে কথাটা একটু ন্যাকা হয়ে গেছে, ভাবলাম—থিয়েটার দেখা তো খুব হোল, এই না হয় একটু শোনা যাক্। বললাম—"ওর মাথায় এখন ঐ ঢুকে গেছে। একবার দেখে আসবে—পশুপতি আছে কি রকম?"

বলল—"এই আসি দেখে। মাথায় ঢুকে যাওয়ার কথা বলছেন, ও কিছু তুকতাকও করে দিয়ে থাকতেও তো পারে।"

মুখ তুলে চাইলাম, ও বলেই চলল—"সেটা লেগেও গেছে নির্ঘাৎ—তার কারণ পশুপতির একটা দোষও হয়ে পড়েছিল তো..."

"কি রকম?"—প্রশ্ন করলুম।

"সবাই বলে পশুপতি যার পার্ট নেয় তার ভর হয় ওর ওপর—ঠাকুর-দেবতার পার্টই নেয় ও বেশি, প্রেমসে করেও। এবার কিন্তু কেমন ওর একটু তমো হয়ে গিয়েছিল, আর সবার মত স্টেজেই মেরে দেবে ঠিক ক'রে আর অত গা করে নি, দেখছিলেনই তো। তা ভীমসেনও তো ঠাকুরদেবতার মধ্যে, বললেন—তবে রে! .."

বেশ লাগছিল, কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়ল। এই সময় "তোলো!—তোলো!" বলে একটা আওয়াজ হোল এবং ভিড়টা ছড়িয়ে পড়তে দেখি সাত-আটজন লোক পশুপতিকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে মিলিটারী ব্যাণ্ড! ওরা নিশ্চয় মুখিয়ে ছিল ওদিকে, "তোলো-তোলো" শব্দ শুনেই অত খোঁজ না নিয়ে শুরু করে দিয়েছে। আশা তো ঐরকমই করছিল।

আমি আর নিজেকে রুখতে পারলাম না, লাঠিটা উঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললুম—"ব্যাণ্ড থামাও!—থামতে বলো এক্ষুনি, নয়তো ওদের

ঢাকঢোল কাঁসাবো।—একটা লোক একটু ঘায়েল হয়ে পড়েছে—না হয় বাজ পড়েই হোল—তা তাকে কোথায় একটু…”

নাটক না হলেও, নাটকীয় পরিস্থিতির তো অভাব হচ্ছে না—গোড়া থেকেই আচমকা ঐ মিলিটারী ব্যাণ্ড, তার সঙ্গে আমার এই চীৎকার, পশুপতির যেটুকু ঘোর লেগেছিল, একেবারে গেল কেটে। যারা তুলতে যাচ্ছিল তাদের ঝেড়েঝুড়ে সবিয়ে দিল, দু' তিন জন ছিটকেই পড়ল; নিজেও বসে পড়ল পশুপতি; তার পর উঠে হাত দুটো ভীমের পসৃচারে বুকের ওপর জড়িয়ে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বলল—“একটা নয়, অমন দশটা বাজ একসঙ্গে পড়ুক মহারাজ, পোশো বুক পেতে নেবে; কিন্তু আমার প্রশ্ন, অমন বিটকেল আওয়াজ হবে কেন?”

অফিস-ঘর

কোম্পানির ডিরেকটার মিস্টার সান্যালের মেয়ে-কেরানী আমদানি করবার ইচ্ছা কোনকালেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ কেমন একটু মায়ায় পড়ে গেলেন।

ইণ্টারভিউএর জন্যে ডাকাও হয় নি লতিকাকে, পরশু যেন তারিখ, ও দুদিন আগেই এসে স্লিপ-প্যাডে নিজের নামটা লিখে আর্দালীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। মিস্টার সান্যাল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কাগজটার দিকে হেঁটমুখে চেয়ে রইলেন, তার পর বললেন, “আসতে বলগে।”

লতিকা এসে দাঁড়াতে এক নজরে একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলেন। সাজ-গোজ সাদামাটা, পায়ে স্যাণ্ডাল, বয়স বছর

কুড়ি-একুশ, বেশী সুন্দর নয়। তিন সেকেণ্ডও লাগল না, জিজ্ঞেস করলেন, "কী দরকার ?"

উত্তর হল, "অ্যাকাউণ্ট সেকশনে একজন কেরানীর দরকার বলে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়…"

"দাঁড়িয়ে কেন ? বস।…কিন্তু আমি পুরুষ-কেরানী চাই।"

লতিকা বসল ; কুণ্ঠিতভাবে অল্প একটু হেসে বলল, "সে রকম কিছু স্পষ্ট লেখা ছিল না, তাই ‥"

"মেয়ে-কেরানী চাইলেই সেটা লেখা থাকে ; নয় কি ?"

"শিক্ষা যখন আপনারা আমাদেরও দিচ্ছেন "

"সুতরাং কেরানী হতে হবে ?"

"শখ করে পুরুষেরাও হয় না। আমাদের যখন বেরুতে হয়, তখন আরও দায়ে পড়েই ত।…এটুকু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।"

শেষেরটুকু একটু আবদারের সুরে বলে তর্কটাকে যেন খানিকটা নরম করে দিল।

"এমন কী দায়ে পড়েছ ? ছেলেমানুষই ত তুমি।"

"সেইজন্যেই দায়টা আরও বেশী। বাবার পড়াবারই শখ ছিল, যখন আই-এ পড়ি, মারা গেলেন। দাদা বললেন, তুই পড়, বাবার একটা ইচ্ছে, তার পর যখন বি-এ'র রেজাল্টটা বেরুল, তিনিও।…"

"থাক্। চাকরি করতেই হবে ? মানে, কিছু রেখে যান নি তাঁরা ?"

"মাকে, বুড়ো হয়েছেন তিনি, আর একটি ছোট ভাই, এইট্থ ক্লাসে পড়ছে।" আবার সেইরকম একটু হাসল।

একটু চুপচাপ গেল। তার পর মিস্টার সান্যাল বললেন, "পারবে কাজ করতে ?"

"ঠিক তা বলতে পারছি না এখন।"

মিস্টাব সান্যাল একটু চকিত হয়েই আরও মুখটা তুলে চাইলেন, একটা পুরুষ উমেদার হলে উত্তরটা অন্তত অন্যরকম দিত। বললেন, "যদি না পার, আমায় আবার হ্যাঙ্গামটা পোয়াতে হবে ত। বিজ্ঞাপন দেওয়া—তাতে খরচও আছে, তার পর আবার ইন্টারভিউ ..."

লতিকা মুখটা নীচু করে রইল একটু, তার পর কথাটা যাতে ঔদ্ধত্যের মত না শোনায়, সেইজন্য একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল, "বিজ্ঞাপনের খরচটা আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।"

মিস্টার সান্যালও হেসে বললেন, "মন্দ নয়; এ ফেয়ার প্রপোজাল। কিন্তু হ্যাঙ্গামটা ?"

আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল লতিকা, বলল, "মেয়েব মতনই ত; দয়া করেছিলেন বলে একটা সান্ত্বনা থাকবেই বরাবর।

একটু চুপচাপ কবে কলিং বেলেব মাথার পিনটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলেন মিস্টার সান্যাল, তার পর সেটা টিপে দিলেন। আর্দালী এলে বললেন, "জনার্দনবাবুকে ডেকে দাও।"

জনার্দনবাবু এলেন। ঢিলেঢালা স্থূল দেহ, মাথার চুল প্রায় সবকটিই পাকা, গায়ে ঢিলে কোট, বেশী গরম না থাকলেও ঘামছেন এবং একটু একটু হাঁপাচ্ছেন।

মিস্টার সান্যাল বললেন, "এই মেয়েটি জনার্দনবাবু—হ্যাঁ তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

"লতিকা—মিস লতিকা চৌধুরী।"

"শুনলেন। এই দেখ! তুমি দরখাস্ত করেছ ত ?"

" না হলে কোন্ সাহসে আসব বলুন ?"

"সেই অ্যাসিস্‌টেন্টের পোস্টটা জনার্দনবাবু। পরশু ইন্টারভিউ ছিল না ? কজনকে ডেকেছেন ?"

"পাঁচজন।"

"পাঁচখানা চিঠি ইশু, করে দিন, কেন আর কষ্ট করবে। লতিকা আপনার টেবিলেই বসবে। কাজ পিক আপ করুক আপনার কাছে তার পর মাসখানেক পরে একটা রিপোর্ট দেবেন, সেটা বুঝে কনফারমেশন। ···যাও।—আজ একটু দেখিয়ে শুনিয়ে সকাল সকালই ছেড়ে দেবেন।"

ওরা চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে গালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন।

একমাসের মধ্যে তিনটে দিন কেটে গেল। জনার্দনবাবু কাজ দেখিয়ে দেন, ঘাড় গুঁজে একমনেই করে যায় লতিকা। নিজের কাজের চাপ বড় বেশী, তায় আবার কতকগুলো রিটার্নের তাগিদ রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দাখিল করতে হবে, তবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, নিজে হতে বড় একটা প্রশ্নাদি করে না। তবে একটা দোষ, কথা কিছু উঠলে তার সঙ্গে কিছু অবান্তর কথা এনে ফেলে, যা লেজারের নিতান্ত বাইরের। তা ওটা মেয়ে-মাত্রেরই দোষ। কী আর করা যাবে?

একটা মোটা খাতার কাজ শেষ করে, অভ্যাসমত খাতাটা আওয়াজ করেই বন্ধ করে ঘুরে চাইলেন জনার্দনবাবু, প্রশ্ন করলেন, "তোমার হল ওটা?"

"হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, এই হয়ে এল, আর একটু বাকী।"

"শেষ করে ফেল। কেমন বোধ হচ্ছে? ভাল লাগছে কাজ?" খাতা থেকে হাত সরিয়ে বেশ সোজা হয়ে বসেন জনার্দনবাবু।

লতিকার নাকটা একটু কুঁচকে ওঠে, একটু লজ্জিত হাসি ওঠে মুখে,

সেটা বোধ হয় ওর মুদ্রাদোষ। বলে, "খালি ঠিক দেওয়া, খালি ঠিক দেওয়া..."

"এখন ঐ চলবে! আইটেমগুলো চেন, তার পর প্যাঁচালো হিসেব...?"

"ও বাবা! এইতেই মাথা ঘুরে যায়।...যা হবে বুঝতেই পারছি। বাড়িতে আমি বলেও দিয়েছি মাকে, জ্যাঠামশাই। বলেছি একমাসের চাকরি, তারও খানিকটা মাইনে কেটে নেবে..."

"কেটে নেবে! কেন?"

"ঐ যে বললুম না আপনাকে কাল? নতুন বিজ্ঞাপনের টাকাটা আমিই গচ্ছে নিয়েছি ত।"

"নাঃ, তা কখনও কাটে? মানুষটা ওপরেই কড়া, ভেতরটা তাল-শাঁস একেবারে। আর চাকরিই বা যাবে কেন? মন দিয়ে শেখ কাজ।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর হল, "শিখতেই হবে, উপায় কী বলুন?"

তার পর মনে পড়ে গেল লতিকার, একটু উদ্বেগের স্বরেই বলল, "ও জ্যাঠামশাই, আপনার টিফিন করা হয় নি যে এখনও!"

জনার্দন তার ছোট চেম্বারটির বাইরে হলের বড় ঘড়িটার দিকে চাইলেন। বললেন, "কাজের চাপ, মনেই থাকে না মা...!"

"বের করুন টিফিন-বাক্সটা। আর আমি একটা কাজ করেছি, না জিজ্ঞেস করেই জ্যাঠামশাই। ট্রাম থেকে নেমে আসতে আসতে রাস্তার ধারে বেচছে দেখে হঠাৎ খেয়াল হল..."

নিজের ড্রয়ার টেনে কাগজে মোড়া একটা মাঝারী সাইজের চিনেমাটির প্লেট বের করল। বলল, "না জ্যাঠামশাই, আপত্তি করবেন না। দামটা না হয় দিয়ে দেবেন, নিয়ে নেব আমি। বাক্সর মধ্যে থেকেই টেনে টেনে ভেঙেচুরে খান, ও আমি দেখতে

পারি না চোখে। মাসখানেক পরে যখন আমি থাকব না, যা খুশি করবেন।"

জনার্দনবাবুর সেকশনে তাঁর থার্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বিকাশবাবু একটা খাতায় দস্তখত করাতে এসে দেখলেন, টেবিলের মাঝখানে প্লেটে খাবার সাজিয়ে আহার করছেন জনার্দনবাবু। লতিকা কুঁজো থেকে জল গড়াচ্ছিল, গেলাস হাতে করে উঠে এল। দস্তখতটার জন্য অপেক্ষা করতে হল। গল্প দুজন থেকে তিনজনের মধ্যে চারিয়ে পড়ল।

দিন সাতেক পরে বিকাশবাবু খুঁজে পেতে একটা কাজের অজুহাত বের করে একটা খাতা হাতে করে মিস্টার সান্যালের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একটা নূতন কিছু করলে পাঁচজনের মতামতটা জানতে ইচ্ছা করে প্রয়োজন থাক বা না-ই থাক। খাতাটা দেখতে দেখতে মিস্টার সান্যাল বললেন, "একটা নতুন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করলুম বিকাশবাবু।"

"বোধ হয় মেয়েটিকে আমাদের সেক্‌শনে নেওয়ার কথা বলছেন স্যার।"

"হ্যাঁ, কী রকম মনে হচ্ছে।"

বিকাশবাবু জনার্দনবাবুরই প্রায় সমবয়সী, কাজে প্রবেশ করেছেন কিছু আগেই। তবে একটু আয়েসী মানুষ, কাজের চেয়ে আর পাঁচটা কথা নিয়েই থাকতে ভাল লাগে। এতে জনার্দনবাবু যে ক্রমে ক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসলেন আর উনি যে প্রায় যথাস্থানেই রয়ে গেলেন এর জন্য উগ্র কোন রকম আক্রোশ না থাকলেও সুযোগমত দু-একটা কথা কানে তুলে দিতে পারলে এক ধরনের আনন্দই পান। প্রশ্নটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা না দিয়ে একটু মুখ টিপে টিপে হাসলেন।

উত্তর না পেয়ে খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়েই আবার করলেন প্রশ্নটা

মিস্টার সান্যাল, "বলুন, আপনারা হলেন অফিসের সিনিয়ার লোক। কেমন দেখছেন মেয়েটিকে ?"

"আপনার সিলেকশন, ভাল না হয়ে যায় ? তবে···"

"তবে···?" মুখ তুলে চাইলেন।

"যাই না ত ওঁর চেম্বারে বড় একটা, নেহাত দরকার পড়ল দস্তখতটা নিয়ে, কি কোন দরকারী কথা জিজ্ঞেস করতে, গেলুম একবারটি, তা পড়বি ত পড় আমার নজরেই···"

মিস্টার সান্যাল একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, হাতের কলমটা হাত থেকে টেবিলে পড়ে গেল, কি নিজেই রেখে দিলেন, ঠিক বোঝা গেল না, নির্বাক ঔৎসুক্যে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

"কথাটা হচ্ছে, আপনার সিলেকশন, মেযেটি ত বেশ চৌকশই বোধ হচ্ছে, তবে তাকে শেখালে তবে ত শিখবে সে। আমি যদি উলটে তার কাছে গোকুল-পিঠে কী করে তোয়ের কবতে হয তাব হদিস শিখতে যাই···"

"গোকুল-পিঠে !"

"সাতদিন এসেছে মেয়েটি, এর মধ্যে দুদিন হঠাৎ দরকাবে গিয়ে পড়েছিলুম ওঁর কামরায়। প্রথম দিন তেমন কিছু নয়, মেয়েটি প্লেটে খাবার গুছিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে। দেখলুম আগেকার চেয়ে একটু তোয়াজ হয়েছে, মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। তা ভাবলুম, করুক, মেয়েছেলের মন, একটু ছিরি আসবেই ঘরটায়···"

"হুঁ···আর কোন দিন···"

"আজ্ঞে, আজই।···দস্তখতটা করিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছি, আপনি ডেকে পাঠালেন।"

"আজও গোকুল-পিঠে ?"

"আজ্ঞে ওটা আজই দেখলুম স্যার, সেদিন ছিল না, মিছে কথা বলি কেন? সেদিন শুধু গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ির মতন একটু তোয়াজ করা। আজ এদিককার আর সব জিনিসের সঙ্গে প্লেটে গুটিচারেক গোকুল-পিঠে। আমি যখন গেলুম ঐ নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। অন্নপূর্ণা পাঠশালের মেয়ে—সেইখানেই শেখাত সব। কী কী ল্যাগে, কীভাবে করতে হয়—উনি তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন, আর ··"

"আচ্ছা, আপনি যান।" শুনতে শুনতেই খাতাটার এক জায়গায় একটা টিক্ দিয়ে দস্তখত বসিয়ে সামনে ঠেলে দিলেন। বিকাশবাবু চলে গেলে, সিগারেটের টিনটা খুলে একটা সিগারেট বের করে নিলেন।

একটু পরে জনার্দনবাবুর ডাক পড়ল।

"আপনার রিটার্নটা শেষ হল জনার্দনবাবু?"

"প্রায় হয়ে এল স্যার। ·একটু—কী যে বলে "

"আমারও ভুল দেখুন না, ঠিক এই সময় আবার লতিকাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার ভাবটাও দিলুম আপনার ওপর চাপিয়ে।·· তা হপ্তাখানেক ত হল, কী রকম দেখছেন?"

"পরিষ্কার মাথা স্যার। বাজিয়েই নিয়েছেন ত আপনি, এর মধ্যেই যা পিক আপ করেছে, অন্য কেউ হলে ·"

"তাই আমি ভাবছিলুম, এবার না হয় গিয়ে বিকাশবাবুর কাছে বসুক···"

কলিং বেলটাতে একটা টোকা মারলেন, আর্দালি এসে দাঁড়ালে বিকাশবাবুকে ডেকে দিতে বলে আবার জনার্দনবাবুকেই বলে চললেন, "বিকাশবাবুর ফুরসুতও আছে—আর আপনার এদিকটা ত খানিকটা দেখলও। কী বলেন?"

একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিলেন জনার্দনবাবু। প্রশ্নটায় সচেতন হয়ে উঠে বললেন, "আজ্ঞে মন্দ কী?...মানে, এইটেই ভাল ব্যবস্থা হবে। রিটার্নগুলোর জন্যে ঠিক মনও ত দিতে পারছি না ওর দিকে..."

বিকাশবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিস্টার সান্যাল সিগারেটের ছাইটা ছেড়ে বললেন, "একটা কথা ভাবছিলাম বিকাশবাবু—জনার্দনবাবুরও তাই মত—বলছিলুম, লতিকা না হয় আপাতত আপনার সঙ্গেই বসুক প্রিলিমিনারি আইডিয়া কতকগুলো ত পেয়েই গেছে ওঁর কাছে। তাহলে আপনার টেবিলটা না হয় ও ভিড়ের মধ্যে থেকে একটু আলাদা করেই নেবেন? ধরুন হলের উত্তোর কোণটায়...একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছি ত?"

দুটো দিন কেটে গেল। বিকাশবাবুর চেয়ারটা খালি, কী একটা কাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে গেছেন। যানও বেশী, গেলে একটু বিলম্বও হয়। লতিকা খাতা খুলে বাঁ হাতে কপালটা রেখে কী একটা কথা ভাবছিল। ওদিকে কী কথা হয়েছে, বিকাশবাবু তার হাসির জের মুখে করে এসে বসলেন। বললেন, যত্তো সব!...তোমার ওটা হল?" ঘাড়টা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কৈ, শেষ করনি ত?"

"করে দিচ্ছি এক্ষুনি।" বলে লতিকা মুখ কাত করে একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

"কী, ভাবছিলে যেন।...তোমার মার শরীরটা আজ কী রকম?"

"কী করে বলি? চাকরি করছি বলে আজকাল আবার খারাপ থাকলেও লুকোন।"

"তবেই দেখ ! অথচ তুমি যে একটু মন দিয়ে চটপট করে শিখে নেবে···অথচ, ওঁর এদিকে খুবই আগ্রহ, একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছেন তো। আজও জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তো বলে যাচ্ছি—বেশ পিক-আপ···"

"ভাল কথা মনে পড়ে গেল জ্যাঠামশাই, আপনার মেয়েকে কাল এসেছিল দেখতে ?"

বিকাশবাবুর হাসি-হাসি মুখটা একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বললেন, "এসেছিল, হল না মা।"

"নিশ্চয় গান আর হাতের কাজের জন্যে ?"

"হাতের কাজের নমুনা দেখে গানের কথা আর তুললেও না। তার ওপর দেখলেও তো অজ পাড়াগাঁ। আমি হপ্তায় দুটো দিন কাটাই। তাও পুরো দুটো দিনই বা কোথায়। তাইতেই যেন হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তাই মনে করছি মাস কয়েকের জন্যে না হয় কলকাতাতেই একটা ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে চলে আসি, তারপর মেয়ে-টিউটার রেখে গানের—আর সেলাই, হাতের কাজ এই সবের একটু ট্রেনিং দিয়ে—যোগাড় হয় তো এইখানেই বিয়েটা দিয়ে···"

"নিয়ে আসুন জ্যাঠামশাই, নিশ্চয় নিয়ে আসুন, আর দু মত করবেন না। অন্য জায়গায় নয়, আমাদের পাড়াতেই, আমি বাড়ি ঠিক করছি। আর ট্রেনিং-এর জন্য আপনি অন্য ব্যবস্থা কী করতে যাবেন ? দুটোতেই আমি নিজে এমন তালিম দিয়ে দোব !"

মুখটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিকাশবাবুর মুখেও হাসি-হাসি ভাবটা ফিরে এসেছে ; প্রশ্ন করলেন, "তুমি জান ?"

"কত প্রাইজ পেয়েছি। গান আমার তো সাবজেক্টই ছিল ম্যাট্রিকে !"

"সত্যি নাকি ?"

আলোচনা চলে। প্ল্যান তোয়ের হয়। অবশ্য চাপা গলাতেই। তবে এমন নয় যে, যারা হলের এদিকেই থাকে, একটু কান পেতে থাকলে তাদের শুনতে বিশেষ অসুবিধা হবে। বিকাশবাবুর এদিক দিয়ে একটা অবহেলার ভাব আছেই। লতিকাও হলের দিকে পিছন করে বসে ; আশে পাশে কাদের কলম থেমে গেল, খোঁজ রাখে না। স্বভাবটা মুক্ত আর সপ্রতিভ, হয়তো গ্রাহ্যও করে না।

বলে, "সে তো পরের কথা, ব্যবস্থা করতে করতেও কিছুদিন হয়েই যাবে। এর মধ্যে আমি এক মতলব ঠাউরেছি জ্যাঠামশাই··· এই দেখাই আপনাকে।"

সুদৃশ্য কাঠের হ্যাণ্ডেল দেওয়া একটি র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে আসে অফিসে, তার মধ্যে থেকে ছোট বড় কয়েকটি নক্‌শার কাজ বের করল, বলল, "এইগুলি নিয়ে যান বাড়িতে জ্যাঠামশাই, যদি এর মধ্যে কেউ দেখতে আসে তো···"

"কাতুর বলে চালিয়ে দোব ?" একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন বিকাশবাবু।

"কিচ্ছু দোষ নেই জ্যাঠামশাই ; আমাদের পাড়ার কটা মেয়ে এই দেখিয়ে পার হয়ে গেল।" একটু গম্ভীর হয়ে, আর কতকটা যেন আক্রোশের বশেই বলে লতিকা, "ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।··· মেয়েদের যেগুলো আসল দরকার, সে সব বাদ দিয়ে যেগুলো সেকেণ্ডারি, সেগুলোর ওপর ঝোঁক দেওয়া এত বেশী করে, এ আমি বুঝি না জ্যাঠামশাই'। আর তাতেও যদি মনে খুঁতখুঁতি থাকে আপনার, আমি কথা দিচ্ছি বিয়ে হবার আগে আমি আপনার মেয়ের হাত দিয়ে ঠিক এই জিনিস বের করিয়ে দেবই ; তাহলে তো আর

ঠকানো হল না ?"

হাসে ; আবার আলোচনা হয়। এক সময়ে একটু সচকিত হয়ে ঘাড় উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে ওঠে, "এই দেখুন, ভুলেই গেছি! জ্যাঠামশায়ের খাবারটা ঠিক করে দিয়ে আসি। ভাববেন, দেখেছ, টেবিল ছেড়ে গেছে তো আর সম্বন্ধই নেই। বুড়োমানুষ···"

কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এসে দেরাজ টেনে ব্যাগটা বের করে নিল। একটু সকুণ্ঠ হাসি ফুটেছে মুখে, বিকাশবাবু একটু বেশী করে গলাটা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আজ গোকুল না পুলি ?"

"যান, আপনি তো খাবেন না, বলছি এত করে।" একটু ঠোঁট টিপে হেসে চলে গেল।

দিন চারেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা কানে গেল মিস্টার সান্যালের ; এবার তো আর চেম্বারের মধ্যেও না ; তা ভিন্ন জনার্দনবাবু খুব সূক্ষ্মভাবে একটু কলকাটিও টেনে থাকবেন নিশ্চয়। চিন্তার মধ্যে একটা গোটা সিগারেট পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তারপর কলিং বেল টিপলেন। আর্দালি এলে বললেন, "হারানবাবু··· ।"

হারানবাবু এ্যাকাউন্ট্ সেকশনে সেকেণ্ড এ্যাসিসট্যাণ্ট, জনার্দনবাবুর পরেই। বয়স্থই, ওঁদের দুজনের চেয়ে ছোট ; পঞ্চাশ-বাহান্নর মধ্যে। একটু ফিটফাট, এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রোগ থাকায় খানিকটা খুঁতখুঁতেও।

এসে দাঁড়ালে বললেন, "ঐ মেয়েটির কথা বলছিলুম, আপনাদের সেক্‌শনে সেদিন যেটিকে ভর্তি করলুম। আমার ইচ্ছে একবার ওকে সেক্‌শনের সব রকম কাজের একটু করে আইডিয়া দিয়ে তার পর ওর

নিজের হাতে কাজ দিই। জনার্দনবাবু আর বিকাশবাবু দুজনের কাছেই হপ্তাখানেক করে বসেছে, এবার আপনি খানিকটা বুঝিয়ে শুনিয়ে দিন। তারপর ওর কনফারমেশনের কথা বিবেচনা করাও আপনার রিপোর্টের ওপর।”

“যেমন বলেন, স্যার।”

“মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তবে ছেলেমানুষ, আর মেয়েছেলেই তো, অফিসের ফর্‌ম, মানে নিয়ম-কানুন—কীভাবে চলতে হয়—সেটা জানে না।”

হারানবাবু একটু কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে টিপ্পনি করলেন, “সেটা আমাদের কাছেই তো শিখবে স্যার, আমরাই যদি ঢিলে দিই…”

“সেই। একটু নজর রাখতে হবে।… তাহলে…”

বেল টিপতে আর্দালি এসে দাঁড়াল। বললেন, “বিকাশবাবু…”

এলে প্রশ্ন করলেন, “লতিকা আপনার কাছে তো কাটাল কটা দিন; কিরকম দেখলেন?”

“বেশ শার্প। হাঁ করলে বুঝে নেয়।”

“তাহলে আপনাদের দুজনের কাজ তো দেখলই, এবার হারানবাবুর কাজের নেচারটাও একটু বুঝে নিক। ওঁকে সেই জন্যে ডেকেছি। আমার ইচ্ছে সবার টেবিল থেকে একটু ঘুরিয়ে আনি ওকে। হ্যাঁ, তাহলে হারানবাবু আপনি দিন কতকের জন্যে ঐ কোণটায় গিয়ে বসুন—বিকাশবাবু যেমন বসছিলেন। আপনারাও একটু নজর রাখবেন বিকাশবাবু…”

“সেকি বলছেন স্যার!…আপনি একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট্ করছেন—সবারই দায়িত্ব আমাদের…”

দুটো দিন গেল। তৃতীয় দিন লতিকাকে জনার্দনবাবুর চেম্বারেই

বসতে হল, হারানবাবুর অনুপস্থিতির জন্য। চতুর্থ দিন খাতা খুলতে খুলতেই কথাটা তুলল লতিকা, "আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কাকাবাবু?"

"হ্যাঁ। দেখ না, পেটটা ভাল ছিল না। তবু আসছিলুমই একরকম না খেয়ে, হঠাৎ কোমরের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল, আর বেরুতে দিলে না।"

"বাত নিশ্চয়, কাল আবার অমাবস্যা ছিল তো।"

"অমাবস্যায বাড়ে, না? বলে বটে অনেকে, যদিও ডাক্তারেরা মানতে চায় না।"

খোলা খাতাব ওপর হাতটা রেখে ঘুরে চাইলেন হারানবাবু।

লতিকাও তর্কের ভঙ্গি নিযে ঘুরে বসল। বলল, "ডাক্তারে না মানলেই যে মিথ্যে হযে যাবে, তা তো হতে পাবে না কাকাবাবু। আমাব মাব বযেছে, দেখছি তো। একাদশীটা সামলে যায়, উপোস কবতে হয তো; কিন্তু অমাবস্যার দিন "

"কাবু করে ফেলে?"

"মাকে ঠিক কাবু কবে ফেলতে পাবে না। একটা মাদুলি ধারণ কবেছেন, তাব ওপব টোটকা কবেন একটা ··"

"কাজ হয টোটকাতে?"

"মার টোটকা? নিজেব মা বলেই বলছি না, বড় বড় বিলিতী ওষুধের দোকান হাব মানে। আব তো বিলিতী ওষুধ ঢুকতেও দেন না বাড়িতে···"

"সত্যি নাকি?"

"ওঁর বিশ্বাস, ডাক্তারেরাই মেরে ফেললে বাবাকে।···আপনার তো অনেক দিনের ডিস্‌পেপসিয়াও আছে শুনলুম।"

"আজ পাঁচ বছর থেকে নাগাড়ে ভুগছি।"

"এক মাসের মধ্যে চাঙ্গা করে দেবে, এমন ওষুধ আছে মার কাছে।…আপনার হাঁপানি আছে?"

"নেই একেবারে বলতে পারি না—মনে হয় যেন একটু একটু টান আসে মাঝে মাঝে…"

"তাহলে এই সময় সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল কাকাবাবু। গাছ-গাছড়া চেনেন? মার কাছ থেকে জেনে এসে বলে দিলে যোগাড় করে নিতে পারবেন?"

"দু-একটা চিনতে পারি হয়তো।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। কোন হাঙ্গাম করতে হবে না আপনাকে। আমি বিকাশ জ্যাঠামশাইকে এই প্যাটার্নের বইটা দিয়ে আসি কাকাবাবু।…এক্ষুনি আসছি…"

এবার কথাটা পৌঁছতে আরও কম সময় লাগল; নূতন এক্‌সপেরিমেণ্টের আলোচনাই তো চলছে আজকাল আপিসে। তবে একটা সিদ্ধান্ত করে উঠতে এবার আরও সময় লাগল মিস্টার সান্যালের।

সেল্‌স-ম্যানেজার নরহরিবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

লোকটি ফার্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। আর সেইজন্য একটু স্পষ্টবক্তাও। এবং সেইজন্য নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ডাকেন মিস্টার সান্যাল। বিপদের কথাটা বললেন। ওঁর ডিপার্টমেণ্টে নেওয়া সম্ভব হবে কি? জ্র দুটো কুঁচকে একটু হাতমুখ নেড়েই কথা বলা অভ্যাস নরহরিবাবুর। বললেন, "না স্যার, এমনি জোর করে দেন, উপায় থাকবে না। তবে যদি জিজ্ঞেস করেন—করেসপন্ডেন্স, রেকর্ডস্, অ্যাকাউণ্টমেণ্ট, কোন ডিপার্টমেণ্টেই পাঠাতে পরামর্শ

দোব না। ...ও একটা পাকা গিন্নী এনে আপিসে তুলেছেন কোথা থেকে স্যার! কাকে গোকুল-পিঠে, মুগসামলি, সরুচাকলি, ভাজাপুলি খাওয়াতে হবে; কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, তালিম দিয়ে তোয়ের করে দিতে হবে, সব ওর ভাবনা। তারপর শুকনো গাছগাছড়ায় তো টেবিল বোঝাই করে ফেলেছে স্যার। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে টোটকায় সেকেলে বুড়িদের নাক কাটে। দেখে যাচ্ছি মুখ বুজে—একটা এক্স-পেরিমেন্ট করছেন আপনি—জিজ্ঞেস করেন নি, ওপরপড়া হয়ে বলতেও পারি না..."

মিস্টার সান্যাল একটু সংকুচিত হয়ে বললেন, "মেয়েটি বড় দুঃস্থ নরহরিবাবু, তাই ছাড়াতেও পারছি না। বড় ভালও এদিকে..."

"ভাল একশবার; দেখছি তো। তা বলে অপিসটা তো দিদিমাবুড়ীর সংসার নয় স্যার। কানাঘুষোতেই শুনলুম, আপনি নাকি ওকে অ্যাকাউন্ট সেকশনের সবটুকু ঘুরিয়ে আনবেন। বলব বলব মনে কবেছিলুম, এমন সময় আপনি নিজেই ডেকে পাঠালেন। বলছিলুম—আর এগুনো ঠিক হবে না স্যার—আমার মত এই—অবিশ্যি আপনি যেমন ভাল বোঝেন· ·"

মিস্টার সান্যাল একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, "বুঝলুম না তো নরহরিবাবু! আর এগুনো—মানে?

"অ্যাকাউন্টসে এখন তো চারজন, সলিল এখন ঐ সেকশনের কাগজপত্র দেখছে তো..."

অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। বললেন, "না, না, তা কি পারি নরহরিবাবু—তা কখনও পারি? এঁরা ট্রেনিং দেবেন, দিতে পারেন, তাই পাঠিয়েছিলুম। সলিল কী ট্রেনিং দেবে?...মানে...নাঃ—আচ্ছা, আপনি আসুন—দেখি কী করা যায়..."

সলিল সান্যাল পুত্র ওঁর। ইউরোপ ঘুরে এসে সম্প্রতি আপিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে মাসখানেক থেকে। ওদিককার কটা বিভাগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবার অ্যাকাউন্টসটা শেষ করে বেচাকেনার বাজারটা ঘুরে ফিরে দেখবে।

সলিল অবশ্য নিজেই ট্রেনিং-এ রয়েছে, ও আর কাকে ট্রেনিং দেবে। তবু নরহরিবাবুর মন্তব্যে ওর কথাটা মনে খুব আনা-গোনা করতে লাগল। ও যে এই ডিপার্টমেণ্টেই এখন রয়েছে, এটা অতটা খেয়ালই হয়নি। নইলে···নইলে এ নূতন এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করতে যেতেন কি ভরসা করে?

সেদিন উপরোউপরি দুটো সিগারেট পুড়িয়ে ফেলতে হল মিস্টার সান্যালকে। এবার একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করতেও পুরোপুরি চারটে দিন লেগে গেল। মাঝখানে সলিল এসে পড়ায় ব্যাপারটা তো আরও জটিল হয়েই পড়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত লতিকাকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালেন।

এলে বললেন, "বস।···ইয়ে—বলছিলাম—তোমার প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা তো শেষ হয়ে এল, আর মাত্র দুটো দিন বাকী, কী রকম মনে হচ্ছে? পারবে কাজ?"

"ওঁরা তিনজনে তো রিপোর্ট দেবেন···"

"একজনের পেট পুলিপিঠে-গোকুলপিঠেয় ভর্তি, একজনের মেয়ের বিয়ের অনেকটা সুরাহা করে ফেলেছ, একজনের ডিস-পেপ্‌সিয়া-হাঁপানির···"

মুখটা বেশ গম্ভীর। লতিকার চোখ দুটি ছল-ছল করে উঠেছে। এমন আতুর ভাবে মুখের পানে চেয়ে আছে যে, আর এগুতে পারলেন না। লতিকাই কথা কইল। বলল, "বড় কষ্ট হয়। বুড়ো

মানুষ, দেখলুম জলটি পর্যন্ত গড়িয়ে নিতে হয় নিজেকে। …আমায় ছাড়িয়েই দিন, সত্যিই পারব না…”

“সত্যিই পারবে না তুমি, নইলে এবার ভেবেছিলুম নিজের চেম্বারেই নিয়ে এসে বসাব তোমায় দিনকতকের জন্যে ; ওদিকটা তো হল। তা আমার আবার যেমন খাবার লোভ, তেমনি হরেকরকমের ব্যাধি, আর…”

“আর লজ্জা দেবেন না আমায়, আমি না হয় নিজেই রেজিগনেশন্ দিচ্ছি—আজই…”

“তাই দেবে ?…না হয় ওঁদের রিপোর্ট তিনটে আসুক না…বেশ, এখন যাও। একটু ভাববার সময় নাও বরং।”

সেদিন সন্ধ্যায় লতিকাদের বাড়ির সামনে একটি মোটর এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। লতিকাই এসে দরজা খুলে দিল। মিস্টার সান্যাল আস্তে আস্তে নেমে ওর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, “তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আছেন তিনি বাড়িতে ?”

বিমূঢ়ভাবে মাথাটা একটু হেলিয়ে লতিকা জানাল আছেন ; নিয়ে গেল ভিতরে। তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিমূঢ়ভাবেই দাঁড়ালেন সামনে। মিস্টার সান্যাল নমস্কার করে বললেন, “আমি লতিকাদের আপিসের সায়েব ; যদিও চেহারায় বা পোশাকে সেটা সাব্যস্ত করতে পারছি না আপনার কাছে…”

লতিকাকে বললেন, “তুমি যাও মা, তোমার নামে নালিশ আছে তোমার মার কাছে, শুনতে পারবে না। বরং দেখ তো, জনার্দনবাবুর জন্যে যা তোয়ের করেছিলে তার ঝড়তি-পড়তি কিছু আছে কিনা হেঁসেলে…”

পাড়াগাঁ-ই, তবে মাঝখানটা একটু শহরের মত।

এটুকু বহুপূর্বে গড়ে উঠেছিল একটি নীলকুঠিকে আশ্রয় করে। তার পর নীল গেল, নীলকর কিছুদিন জমিদারি নিয়ে রইল, অবশেষে স্থানীয় এক বড় রাজার হাতে সেটাও বিক্রয় করে দিয়ে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলে গেল।

এখন জায়গাটা রাজের একটা সার্কেল বা তহসিল-কেন্দ্র হয়ে আছে। একজন সার্কেল ম্যানেজার, তাঁর অধীনে বেশ বড় একটি কর্মচারীর গোষ্ঠী, আধুনিক আপিসের কেতায়; এর অতিরিক্ত তহসিলদার, পাটোয়ারী, পাইক, বরকন্দাজ; জায়গাটার লুপ্ত মর্যাদা দু-তিন গুণ হয়ে ফিরে এল। সময়েরও পরিবর্তন হয়েছে, লোকের চোখ খুলেছে, তুমি রাজা তো বসে বসে যে শুধু দুইবে সেটি হচ্ছে না, যেমন দুইছ তেমনি চারিয়ে দিতে হবে দোহন-করা দুধ। স্কুল হল, হাসপাতাল হল, তার পর এ-সোসাইটি, ও-সোসাইটি,—সে-জায়গাকে আর চেনা যায় না।

আমি গেলাম স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। সে সময় সার্কেলের ম্যানেজার এবং স্কুলের প্রেসিডেন্ট এক ইংরাজ। নামটা একটু বদলে রাখা গেল মিস্টার গ্রেশাম।

বড় ভাল লোক ছিলেন গ্রেশাম সাহেব, বড়দের টেনে তুলনা করলে বলা যায় হেয়ার, বেথুন—এঁদের দলের লোক। দেশীয়

লোকেদের ওপর একটা প্রাণের টান ছিল। ওঁদের কথা তো সামান্য-ভাবে বলতে পারি না, তবে গ্রেশামের বেলায় দেখেছি এই টানের উল্টো পিঠে আর একট জিনিস ছিল, সেটা ছিল নিজেদের সম্বন্ধে একটা ক্রোধ বা অবজ্ঞার ভাব, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে দুইয়ের মিশাল। সেটা এদেশীয়দের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের অনুপাতে বাড়ত। ইংরাজের মুখে ইংরাজদের উদ্দেশে গাল ছুটত।

স্কুলটাকে বিশেষ করে ভালবাসতেন গ্রেশাম সায়েব। এই হিসাবে হেয়ার বেথুনের সঙ্গে তাঁর মিলটা ছিল যেন আরও বেশি। সাধারণভাবে প্রজাদের জন্য যতটা সাধ্য করতেন, কিন্তু রাজের সার্কেল-ম্যানেজার হিসাবে তাঁর শক্তি ছিল রাজের আইন-কানুনের দ্বারাই সীমিত। স্কুলের ব্যাপারে সে-শক্তি ছিল মুক্ত। সেই মুক্ত শক্তিকে পূর্ণভাবেই নিয়োজিত করতেন তিনি। স্কুলটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার দিকে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা তো ছিলই, তার চেয়েও বড় কথা, তিনি স্কুল আর নিজের মধ্যে কোনও দূরত্ব রাখতেন না। প্রায়ই কাজের অবকাশে, অনেক সময় কাজের মধ্যেও আপিস ছেড়ে চলে আসতেন; শিক্ষকদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, নিজের দেশের কথা বলে অনুপ্রেরণা যোগাবার চেষ্টা করতেন; খেলার মাঠে উপস্থিতি তো ছিল প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার।

আমায় বলতেন—"I wish I could exchange places with you Headmaster" (ইচ্ছে হয় তোমার সঙ্গে জায়গা বদল করে নিই হেডমাস্টার)।···বলতেন—"Help them to attain full stature of manhood. Enough of Babus already" (ওদের গোটা মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য কর। বাবু যথেষ্ট হয়েছে)।

বাবু অর্থে উনি বলতে চাইতেন কেরানি। ভারতীয় পদ্ধতিতে

ওখানকার লোকের কাছে সার্কেলের একজন সাধারণ কেরানির মর্যাদা যা ছিল, বোধ হয় হেডমাস্টারেরও তা ছিল না। কিন্তু গ্রেশাম সায়েবের কাছে ব্যাপারটা যেন উল্টে গিয়েছিল। অবশ্য কখনও প্রকাশ হতে দিতেন না। তবে আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে উনি ওঁর উচ্চতম কর্মচারীর চেয়ে যেন স্কুলের নিম্নতম শিক্ষকটিকে একটু মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন।

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বের করে দিয়ে স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছুটির পর নূতন করে ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। আমি একটা ক্লাস নিয়ে বসেছি, কিন্তু মনটা খিঁচড়ে থাকায় কিছুই হচ্ছে না।

স্কুলের নূতন সেসনের (Sessions) সেই চিরন্তন কাহিনী—যে পাস করতে পারল না তাকেও তুলে দিতে হবে। ছেলেদের তদ্বির, গার্জেনদের তদ্বির, কান্না, বেনামী হুমকি—মামুলী যা সব একরকম কাটিয়ে উঠেছি, শুধু এক জায়গায় এখনও রেহাই পাই নি, নবম শ্রেণীর গোকুল পাশ্‌মানের কাছে।

গোকুল সার্কেলের হাতি বীরবাহাদুরের মাহুত বিলট পাশমানের ছেলে। এক শুধু হিন্দীতে পাশ করেছে, তাও টায়েটুয়ে, বাকি সব বিষয়ে খারাপ ভাবেই ফেল, অঙ্কয় শূন্য। তাকে উঠিয়ে দিতে হবে ওপরের ক্লাসে। উদ্ব্যস্ত করে মেরেছে একেবারে। আপিসে এক চোট বকিয়ে মেরেছে। বাপকে ডেকে এনেছিল, তাকে এক দফা বুঝিয়ে, ধমক-ধামক দিয়ে চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, তার পর এই ক্লাসে আসতে নিজে এসে দরজার কাছে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়েছে।

কিছু বলছে না, কিন্তু শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই এমন একটা অস্বস্তি

লাগিয়েছে যে কয়েকবার চেষ্টা করেও আরম্ভ করতে পারছি না কাজ। তার পর এক সময় চেয়ারটা সশব্দে পেছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে খুব কষে একটা ধমক দোব, হঠাৎ বাইরে একটা হৈ চৈ উঠল। প্রথমে একটা মিশ্র কলরব, সার্কেল-আপিসের দিকে, তার পরেই সেটা চারিদিকে চারিয়ে পড়ে কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল—সার্কেলের হাতি বীরবাহাদুর ক্ষেপে গেছে। স্কুলে একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়ল—ছাত্র শিক্ষক সবাই ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় জটলা করে দাঁড়াল।

আমাদের স্কুলের সামনেই ষাট-সত্তর বিঘার একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তার ওদিকেই সার্কেল আপিস, ম্যানেজারের বাংলো। বাংলোটা ডান দিকে একটা মস্ত বড় বাগানের মধ্যে, আপিসের বাঁ দিকে খানিকটা দূরে পিল্‌খানা অর্থাৎ হাতির উঁচু দোচালাটা।

আমিও বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু হাতিটাকে দেখতে পেলাম না। হৈ-হল্লার মধ্যে শোনা গেল সায়েবের বাগানের দিকে গেছে। উৎকণ্ঠিত ভাবে চেয়ে আছি সবাই, দেখা গেল বীরবাহাদুরকে। ইতিমধ্যে মুখে মুখে একটা গল্প স্কুল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বীরবাহাদুরের ভাবটা এদিকে থমথমে যাচ্ছিল। তাই দেখে তাকে ক'দিন থেকে আর খোলা হয় নি, পিলখানার পাশেই একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল, সেই অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয় তাকে। দূর থেকেই 'চারা' অর্থাৎ পাতাসুদ্ধ ডালপালা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল। আজ আপিসের একজন কর্মচারী ওদিক থেকে যাওয়ার সময় নাকি দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে—"কেমন জব্দ, বাঁধা রয়েছ তো?"···ব্যস, শুনতে দেরি, 'চারা'র একটা মোটা ডাল শুঁড়ে জড়িয়েই বোঁ করে ছুঁড়ে দিল বীরবাহাদুর ব্যঙ্গকারীকে লক্ষ্য করে। সে অবশ্য অল্পের জন্যই বেঁচে গেল, কিন্তু সেই থেকেই বীরবাহাদুরের মেজাজ

গেল খোলাখুলি ভাবে বিগড়ে। কোন শব্দ নয়, শুধু শরীরটাকে সামনে পেছনে দোল খাওয়ানো আর শেকলে টান। পাগলা হাতির টান, বেশিক্ষণ লাগল না, খানিকক্ষণ পরেই অশ্বত্থ গাছের সেই অত মোটা শেকড় চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। তারপরে বীরবাহাদুর সোজা ঐ দিকে বেরিয়ে গেছে। কেউ বলছে ও সার্কেল আপিসটাকে আর রাখবে না, কেউ বলছে আসলে ও পাগল হয় নি, সেই জন্যেই বেঁধে রাখাটা বরদাস্ত হচ্ছিল না, তার ওপর কেরানিবাবুর ঠাট্টাটা আরও অসহ্য হয়ে পড়ে। পাগল হলে ও তো তাকেই ডালে-মূলে শেষ করত, সায়েবের কাছে গেছে বিচার চাইতে।

গল্পেরও ডালপালা বেরিয়ে জমে উঠছে, এমন সময় বীরবাহাদুরকে দেখা গেল। হাল্লাটা আবার চাগিয়ে উঠতে দেখি বাংলোর দিক থেকেই হনহন করে চলে আসছে। আপিস খালি করে সবাই পালিয়েছে, ও সামনে এসে দাঁড়াল, কি যেন একটু ভাবল, একবার সামনে পিছনে দুলল, তার পর গটগট করে এগিয়ে গিয়ে শুঁড়টা গুটিয়ে নিয়ে আপিসেব শেকল দেওয়া দরজায় একটা চাপ দিয়ে ভেঙে দিলে সেটা। মচমচ করে যে একটা শব্দ উঠল সেটা এতদূর থেকেও আমরা শুনছি। এর পর মাথাটা গলিয়ে ঢোকবারই চেষ্টা করল, না পেরে শরীরে একটা খুব ঝাঁকানি দিল। একটা শব্দ উঠল "ফঁস্ গিয়া। ফঁস্ গিয়া!" অর্থাৎ আটকে গেছে; কিন্তু সেটা ভাল করে চারিয়ে পড়বার আগেই একটা বেঞ্চিকে শুঁড়ে জড়িয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল বীরবাহাদুর। একটা হাতল, দুটো পায়া আর পিঠের খানিকটা গেছে ভেঙে। বাইরে এনে একবার রাখল, কি ভাবল একটু, তার পর আবার যেন বাগিয়ে ধরে শুঁড়ে টাঙিয়ে নিয়ে এগুল।

মাঠের ওপর পড়ল, তার পর হল স্কুলমুখো।

সে রকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য এর আগে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কোথা থেকে ঘুরে এসেই পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল বলে পিঠের প্যাড বা চটের মোটা গদিটা আর খোলা হয় নি। ডাক নেই কিচ্ছু নেই, হনহন করে এগিয়ে আসছে। চলন্ত হাতিকে বরাবর মাহুত সুদ্ধই দেখেছি, এ যেন এক বীভৎস ব্যাপার। আমি যে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের স্কুলের বাড়ি হয় নি এখনও। ইটের পাঁজা পুড়ছে, বাঁশের ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরেই ক্লাস করছি আমরা, ওর তো দু মিনিটের কাজ, দুটি ধাক্কাতেই ধরাশায়ী করে দেবে। ছেলেদের সব দূরে সরিয়ে দিয়েছি মাঠের অন্য দিকে। আমরা কয়েকজন শিক্ষক যে দাঁড়িয়ে আছি, তা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই। এবার সরেও যাব সব দৈবের ওপর ছেড়ে, এমন সময় একটা ব্যাপারে আবার একটু থেমে গেলাম। মাঠের পাশে একটা মাঝারি গোছের সোঁদাল গাছ ছিল। পাশ দিয়েই আসছিল বীরবাহাদুর, গাছটার কাছে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। তার পর এগিয়ে গিয়ে গুঁড়িটাতে একটা পাঁজরা লাগিযে ব্যালেন্স রেখে এমন একটা চাপ দিল যে গাছটা মড়মড়িয়ে মুচড়ে পড়ল জমিতে। বেঞ্চটা ঠিক সেই ভাবেই আছে ধরা।

এগুল। যেন সম্মোহিত হয়েই দাঁড়িয়ে আছি, হেডপণ্ডিতমশাই বললেন—"আর কত বুঝিয়ে বলবেন উনি? এবার পালান্।"

প্রশ্ন করলাম—"বুঝিয়ে বলা মানে?"

"দেখিয়ে দিলাম তো একটা জ্যান্ত গাছ ভেঙে, তোদের ছ্যাঁচা-বেড়া কতক্ষণ টেঁকবে?…চলুন চলুন আর নয়; স্কুলই লক্ষ্য, দেখছেন না?"

সত্যই আর সন্দেহ নেই ; অর্ধেক মাঠ পেরিয়েও এসেছে। আমরা তাড়াতাড়ি দরজায় শেকলগুলো তুলে সরে যাব, এমন সময় ফের একটা তুমুল কলরব উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি, স্কুলের ছেলেরা যেখানে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে থেকে একটা ছেলে ছিটকে বেরিয়ে বনবন করে একটু পেছন দিক ঘুরে হাতিটার দিকে ছুটছে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা, গায়ে জামা নেই। প্রথমটা বুঝতেই পারলাম না, তার পরেই ঐ হল্লার মধ্যে নামটা উঠল জেগে।…"গোকুল হ্যায়!…আরে গোক্‌লা, মৎ যাও!…গোক্‌লা মরনে যাতা হ্যায়?…

গোকুল কিন্তু ছুটেই চলেছে, এমন একটা বড় চক্কর দিয়ে—যাতে হাতিটা দেখতে না পায়। পেছনে চলে গিয়ে যতই এগুতে লাগল ততই তার গতিবেগ কমিয়ে আনল। হাতিটা সোজা চলে আসছে, তবে আস্তে আস্তেই, দোল খেতে খেতে, শুধু পায়ের ধাপে যেন একটা দৃঢ় সংকল্প উঠছে ফুটে, অন্তত আমাদের মনে হচ্ছে এই রকমই। গোকুল পা টিপে টিপে একেবারে পিছনে গিয়ে পড়ল। কয়েকটা নিশ্বাস-রুদ্ধ-করা মুহূর্ত, অত গোলমাল একেবারে গেছে থেমে, একটা উৎকট আশঙ্কায় সবার কণ্ঠ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে! তারই মধ্যে গোকুল একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে খপ করে ল্যাজটা ধরেই তড়বড় করে উঠে গিয়ে প্যাডের দড়িটা ধরে ফেলল, এবং পরমুহূর্তেই হামাগুড়ি মেরে প্যাডের ওপর দিয়ে একেবারে কাঁধের ওপরে চলে গেল, এবং দুই হাতে যতটা পারল জাপ্‌টে ধরে গুটিয়ে-সুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

হাতিটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল কয়েক সেকেণ্ড ধরে, তার পরেই মাথায় ঝাঁকোনি দিয়ে, শুঁড় আছড়ে,

সারা শরীরে দোলা দিয়ে ছেলেটাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। বলতে ভুলে গেছি, বেঞ্চিটার দফা এর আগেই শেষ করে এনেছে দুটো আছাড় মেরে, শুঁড়টা রয়েছে মুক্ত।

ছেলেটা যে কি করে সামলে রয়েছে এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, শুধু এইটুকুই দেখতে পাচ্ছি ওর কাঁধের খাঁজটার মধ্যে একেবারে যেন মিশে রয়েছে, আর যেদিকে শুঁড় আছড়াচ্ছে তার উল্টো দিকে শরীরটা ঠিক তালের মাথায় গুটিয়ে নিচ্ছে। যত দূর আন্দাজ করছি, হাতির ঘণ্টার দড়িটা ওকে হয়তো সাহায্য করছে।

কয়েক মিনিট গেল, লোকগুলোর একটু যেন সাড় হয়েছে, গোকুলের নাম ধরে আবার আদেশ-উপদেশ শুরু হয়েছে, এমন সময় হাতিটা হঠাৎ ঝাঁকানি, শুঁড় আছড়ানি বন্ধ করে আবার সেইভাবে থমকে দাঁড়াল।

গোকুল আস্তে আস্তে উঠে বসল, একটু চুপ করে যেন ভাবটা বুঝে নিল, তার পর আস্তে আস্তেই মাথার মাঝখানে গোটা দুই আঘাত দিয়ে নিজের মাথাটা একটু ওর ডান কানের দিকে ঝুঁকিয়ে ডাকল—"বীরবাহাদুর !—বেটা !"

বীরবাহাদুর শরীরটা একটু দোলাল, কানদুটো বারকয়েক নাড়ল। তার পর গোকুল আর একবার সেইভাবে ডাক দিতে 'কুঁ!' করে অনেকটা করুণ সুরে একটা টানা শব্দ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা হর্ষধ্বনি উঠল—"আব মান লিয়া! আব মান লিয়া!"

অর্থাৎ এবার ঠাণ্ডা হয়েছে বীরবাহাদুর, বশে এসেছে। গোকুল ওদের হাতি-চালানো ভাষায় কি একটা বলল, বীরবাহাদুর মাথাটা একটু দোলাল, ঝাঁকানি নয়, তার পর ডানদিকে ঘুরল। গোকুল

আর একটা কি বলল। বোধ হয় একেবারে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পিলখানায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু হাতি আর ঘুরল না, সোজা ডান দিকেই চলল। আবার যেন সেইরকম বেয়াড়াপনার ভাব।

এমন সময় দেখা গেল গ্রেশাম সায়েব ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন বাংলোর সামনের রাস্তা দিয়ে। সকালে খাসমহলের চাষ আবাদ দেখে বেড়ান, বোধ হয় দূরে চলে গিয়েছিলেন, খবর পেয়ে এসে পড়েছেন। "ঘোড়া ছোড়িয়ে হুজুর! ঘোড়া ছোড়িয়ে!"—বলে আবার একটা কলরব উঠল ওদিকটায়। ঘোড়া দেখলে হাতি ভড়কে যায় এ-তত্ত্বটা সাহেবের নিশ্চয় জানা, হয়তো ঝোঁকের মাথায় চলে আসছিলেন, নেমে পড়ে এক জনের হাতে লাগামটা দিয়ে একটা রাইফেল আনতে বলে প্রায় ছুটেই এগুলেন এবং সবার মানা সত্ত্বেও মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ওঁর জন্যেই ওদিক থেকে আমলা-পাইকদের মধ্যে অনেকে এগুচ্ছিল, একটু কড়া টোনে মানা করতেই থেমে গেল সবাই। সায়েব আসতে আমরাও সবাই ঘুরে ঐদিকে গিয়েই দাঁড়ালাম।

এদিকেও কিন্তু ততক্ষণে একেবারে সামলে গেছে। হাতিটা নিশ্চয় সাময়িক ভাবেই খানিকটা বিগড়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে সামলাবার ব্যাপারে হয়তো বংশানুক্রমে মাহুতের ছেলে গোকুলেরও কিছু হাত ছিল—বিলট থাকলে হয়তো আরও বাগ মেনে যেত, যাই হোক, সায়েবের দিক থেকে মনটা এদিকে এসে পড়তে দেখি গোকুলের আর একটা হুকুমে হাতিটা আরও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাইফেল দিয়ে গেছে, সেটা নিয়ে এগুচ্ছেনই সায়েব—যদিও এ অবস্থায় কি করবেন সেটা নিশ্চয় ঠিক করে উঠতে পারেন নি—গোকুল হাত তুলে বলল—"মৎ বঢ়িয়ে হুজুর—লে আতে হ্যায়!"

তবুও সাহেব এগুচ্ছিলেন, গোকুল একটু হুকুমের টোনেই বলল—"কহতে হেঁ মৎ বঢ়িয়ে ; বন্দুক পিছে কিজিয়ে !"

বোধ হয় পূর্বের ড্রিলের অভ্যাসেই, যেন কোন কম্যাণ্ডারের হুকুমে সায়েব অনেকটা অ্যাটেন্‌শানের ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। অভ্যাসই, তখনই আবার সহজ করে নিলেন নিজেকে, তবে রাইফেলটা পেছনেই করে নিলেন।

ঘুরেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরবাহাদুর। গোকুল আস্তে আস্তে হাতটা বেশ ভাল করে বোলাল মাথায়, তার পর কয়েকটা চাপড় দিয়ে বলল—"বীরবাহাদুর, বেটা ! অঘৎ !"

"অঘৎ"টা হচ্ছে এগুবার ইঙ্গিত। কানের দু পাশে হাঁটুর ধাক্কাও দিল এবার। বীরবাহাদুর আস্তে আস্তে শরীর দুলিয়ে এগুল। হাত-পাঁচেক তফাৎ থাকতে "রুক্ যা"—বলতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"সেলাম দেও মালিক কো।"

সামনের পা দুটো অল্প মুড়ে শুঁড়টা একটু তুলল বীরবাহাদুর।

"আব দানা মাঙো।" (অর্থাৎ এবার খাবার চাও)

বীরবাহাদুর এবার ভাল করে শুঁড়টা তুলে একটা আকাশ-পাতাল হাঁ করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই করুণ শব্দ—"কুঁ-উঁ-উঁ-উঁ…!"

আরও সবাই এগিয়ে এসেছে। সায়েব ঘুরে হুকুম দিলেন—"জলদি দানা হাজির কর—বাদাম, চাওয়াল, ধান, গেহুঁ !"

ছুটল একপাল লোক।

বিকালে সায়েবের বাংলোর সামনে খোলা চত্বরটায় একটা জমায়েৎ বসেছে—স্কুলের সব শিক্ষক, অফিসের কয়েকজন বড় বড়

আমলা, গোকুল আর তার বাবা বিলট। বিলট পাগলামির জন্য কিছু গাছ-গাছড়ার সন্ধানে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে।

দূরেও এখানে ওখানে কিছু কিছু লোক জড়ো হয়েছে। গোকুলকে বখশিশ দেওয়া হবে। গোকুলকে একটা চেয়ারই দিয়েছিলেন সায়েব, না বসায় একটা টুল পেয়েছে।

ওকে জিজ্ঞেস করতে ও কিছু বলে নি। বারকয়েক প্রশ্ন করে যখন দেখলেন শুধু ঘাড়টাই যাচ্ছে নুয়ে, ওর বাবাকেই বললেন—"বোল বিলট, কেয়া মাংতা তোমহারা লড়কাকে বাস্তে।"

বিলট একপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত দুটো জোড় করল।

"বোল, বোল, তোমহারা লড়কাভি বীরবাহাদুর হ্যায়। নেহি তো হাম বোলেঁ ?"

সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছি। খুব বড় রকম কিছু দেওয়ার জন্য সায়েব যে প্রস্তুত আছেন সেটা সবাই আন্দাজ করেছি, হয়তো যাতে ও মানুষই হয়ে যায়। আমি আবার একটা দায় থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছি বলে আরও উৎসুক।

ঠোঁট দুটো খুলেও একটু যেন আটকে গেল কথাটা বিলটের মুখে, আশাতিরিক্ত কিছু চাইতে গেলে যেমন হয়, তার পর ঘাড়টা একটু কাৎ করে বলল—"পারমোশিন্ হুজুর ; উসকো কিলাস্‌মে উঠা দিয়া যায়।" (হুজুর, প্রোমোশন দিয়ে ওকে ক্লাসে তুলে দেওয়া হোক)।

খাঁটি সায়েব, তবু মুখখানা আজকের মত এত রাঙা আর কখনও দেখি নি, উৎসাহে জ্বলে উঠেছিল যেন।···যেন এক ফুৎকারে নিভে ছাই হয়ে গেল। কত চেষ্টা করে, আওয়াজটা কত দূর থেকে টেনে এনে বললেন—"আচ্ছা, মিলেগা, মিলেগা প্রোমোশন, যাও।"

আমার কাজ ছিল বলে সবাই চলে গেলেও বসে রইলাম একটু। কথাটা কিন্তু তুলব কি করে ভেবে পাচ্ছি না। অস্বস্তির মধ্যে চুপ করে বসে আছি, সায়েব নিজেই মুখ খুললেন; তার আগে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

বললেন—We are killing you by inches Headmaster. This is the limit of their ambition! Such a valiant youth, too!" (আমরা ইংরাজেরা তোমাদের একটু একটু করে শেষ করছি। এমন একটা সাহসী ছেলে, অথচ পাস করে কেরানী হওয়ার বেশি উচ্চাশা নেই ওদের কারুরই।)

যাওস্বর

এবার এলে গোবরা যেন একটু বেশী ঘটা করে প্রণামটা করল বলে মনে হল। বললাম—"বোস, কি খবর?"

একটু অন্যমনস্কও রয়েছে। চেয়ারের হাতল দুটো মুঠিয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে বসতে বসতে বলল—"আচ্ছা দাদা, ক্রিশ্চানদের ও থিয়োরিটা কি রকম মনে হয়?—ঐ যে সমস্ত জীবন ঠেসে পাপ করো, তারপর মরবার আগে পুরুতকে ডেকে একবার সব স্বীকার ক'রে নিলেই হবে।"

একটু হাসবার চেষ্টা করে নিজেই বলল—"না, তা আর হ'তে হয় না, কি বলেন? ছেলের হাতের মোওয়া, না মামার বাড়ির আব্দার?" উত্তরটা শোনবার জন্য অপ্রতিভ হাসিটুকু নিয়ে একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই

চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বুঝলাম, আমি যে এই মাস চারেক ছিলাম না এর মধ্যে ওর নিজের পদ্ধতিতে আবার কিছু একটা করেছে।

একটু চায়ের জন্য ভেতরে হেঁকে বলে দিলাম। গোবরা হাত দুটো জড়ো ক'রে বলল—"থাক্ না, যে যত পাপী তার আবার আপনার কাছে তত বেশী খাতির!"

—এবার হাসিটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বললাম— "কথাটা কি জান গোবর? পাপের স্খালন অনুতাপে। অনুতাপ সেরকম তীব্র না হলে তো নিজের জীবনের গুহ্যতম কথা, পাপের কথা, কেউ কাউকে বলতে পারে না। ক্রীশ্চানদের পাপ-স্বীকার ওটাকে 'অরেক্যুলার কনফেসন' বলে—ও হচ্ছে নিজেকে সেই তীব্র অনুশোচনায় এনে ফেলা।…আরও একটা দিক আছে, বিশ্বাস, সেটা সব ধর্মের মূল কথা— তুমি শিব-পার্বতীর সেই উপাখ্যানটা জান নিশ্চয়—একটা বড় যোগে গঙ্গাস্নানে এসেছে সবাই, খুব ভিড়, ওঁরা দুজনে আকাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, এত লোক যদি শুধু দুটো ক'রে ডুব দিয়ে পাপমুক্ত হয় তা হলে পাপী তো আর থাকবেই না পৃথিবীতে। শিব বললেন— "তুমি কোথায় আছ? এত লোকের মধ্যে মুক্তি পাবে মাত্র ঐ একটি, সে ঐ মাতালটা, সে হেন পাপ নেই, যা করে নি, তার কারণ…"

গোবরার সমস্ত মুখটা হাসিতে যেন ছেয়ে গেল, আমায় একরকম বাধা দিয়েই বলল— "শিবঠাকুরের কথা এসে গেল ভালই হল দাদা, ওঁকে নিয়েই কাণ্ডটা তো।…আশুতোষও তো নাম ওর?"

বললাম—"হ্যাঁ, এক কথাতেই সন্তুষ্ট। তাইতো মনে হয় আমাদের দেব-তত্ত্বে শিবের চেয়ে বড় আর—"

"কিন্তু কি যে দুর্ভোগ বেচারীর—যদি একবার চোখে দেখতেন দাদা !"

এই ধারা ওর কথার, হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হেসে বললাম— "দুর্ভোগ গায়ে না মাখলে পাপীদের দুর্ভোগ ঘোচাবেন কি ক'রে গোবর ?"

"স্বীকার করি দাদা, একশ'বার ; কিন্তু তার একটা সীমা থাকবে তো ? ···দক্ষিণ পাড়ায় যেতে মাঝামাঝি পড়ে— ঠিক রাস্তার ওপর বলা যায় না, একটু বাঁয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা, তার ও-পাশটাতেই একটা মন্দির, দেখে থাকবেন বোধ হয় ?"

বললাম— "ঠিক মনে পড়ছে না গোবর, ওদিকটা খুব কম যাওয়া আসা তো। হয়তো থাকবেও বা।"

"কাজ নেই মনে পড়ে, যা দুর্দশা, চোখ ফেটে জল আসে, নোনা ধরে চারদিক ভেঙ্গেচুরে গেছে, দোর নেই, একটা বটগাছ ওপর থেকে শেকড় নামিয়ে আষ্টেপৃষ্টে ফেলেছে ঘিরে, যেন যাওয়া যায় না। দক্ষিণ পাড়ায় যেতে ক'বার দূর থেকেই দেখলাম—একটা ভাঙ্গা মন্দির তো আছে, অত খেয়াল হয়নি, কতই তো রয়েছে চারদিকে, এসব মন্দিরে তো বিগ্রহও থাকে না—চলে গেছি নিজের কাজে, তারপর এবার জয়চণ্ডীতে যেতে দেখলাম ভালো করে। সেখানে ছেলেরা একটা সেণ্টার খুলেছে, গোড়ায় কটা দিন যেতে হল।

"তাও যে দেখলাম সে নিতান্ত হঠাৎ দাদা। জয়চণ্ডীর সরু মেটে রাস্তাটা ঐ মাঠটা ঘুরে চলে গেছে ওদিকে। দুটো দিন এমনিই চলে গেলাম, তারপর ঐখানটার কাছাকাছি এসে বৃষ্টি নামলো হঠাৎ, শরৎকাল, পূজার কাছাকাছি সময়টা। একেবারেই তো পোড়ো জায়গা, বাড়িঘর কিছু নেই কাছে, জয়চণ্ডী খানিকটা দূরও, কি করব,

কি করব ভেবে ছুটলাম মন্দিরটার দিকে। খানিকটা তো আটকাবেই।

"আটকাবে! গিয়ে দেখি অঝোর ধারে আকাশগঙ্গা নেমেছেন শিবের মাথায়…"

"বিগ্রহ ছিলেন নাকি?"—প্রশ্ন করলাম আমি!

"না থাকলেই ভাল হত, কিন্তু কপালে দুর্ভোগ লেখা, যাবেন কোথায় বলুন। মন্দিরের দোরটা কে পাচার করে দিয়েছে, চৌকাঠ শুদ্ধ্যু। সমস্ত মন্দিরটা গোরু-ছাগলে নোংরা ক'রে রেখেছে, এখানে ওখানে আগাছাও ঠেলে উঠেছে, ফাটলগুলো দিয়ে লতা ঢুকছে,—একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আমাদেরই প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, দেবতা হয়ে উনি যে কি করে টেঁকে আছেন…"

একটু হেসে বললাম—"দেবতা নয় বলেই তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠি আমরা গোবর!"

একটু যেন বোঝবার চেষ্টা করল গোবরা, তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল—"তাও কি ঐখানেই শেষ, তার পরদিন একটু সকাল সকালই যাচ্ছি জয়চণ্ডীতে—বৃষ্টি নামলে অসুবিধেয় পড়তে হয়—মাঠটার কাছ দিয়ে যেতে যেতে ফটাস্ ফটাস্ করে গোটা তিনেক শব্দ হল; প্রথমটা বুঝতে পারি নি, তারপর দেখলাম মন্দিরের মধ্যে থেকেই আসছে। দেখি তো কি ব্যাপার!

"গিয়ে দেখি জন চারেক ছেলে ছক কেটে ঘুটি খেলছে, আর একটি গৌরীপট্টের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতন দুদিকে পা ছড়িয়ে বসে কি করছে। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা শব্দ হয়েছে, গিয়ে ব্যাপারটা বুঝলাম। ছোট ছেলেরা কাদার বাটি ক'রে সেটাকে উলটে মাটিতে আছড়ে এক রকম খেলা খেলে না? বাটিটা ফেটে গিয়ে একটা

শব্দ হয়—সেই খেলা। দিব্যি তেলা-মাথাটি পেয়েছে ঠাকুরের, প্রেমসে ফাটিয়ে যাচ্ছে। চাষী গেরস্তর ছেলে সব, গোরু-ছাগল চরাতে এসেছে, হঠাৎ আমায় দেখে হুড়মুড়িয়ে পালাল।

"দুদিন যেতে পারি নি, তার পর দুপুরেই ওখান দিয়ে পাস করছি, আবার শব্দ! এবার ঠিক সেরকম নয়, সেবার ছিল ফট্-ফট্ হালকা পটকার মতন, এবার বেশ জোরে ঠকাস্ ঠকাস্। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখি বেটারা কোথা থেকে দুটো ঝুনো নারকেল যোগাড় করেছে, খোসা ছাড়ানো, তার একটা ভেঙ্গেছে বাবার মাথায়, আবার একটা ভাঙবার চেষ্টা করছে। একটু সামলে ঠুকতে হবে তো, একেবারে দুখানা হয়ে গেলে জলটা তো বরবাদ হবে। এবার আর সবগুলো পালাতে পারল না, দুটোকে ধবে ফেললাম। ওগুলোকে হেঁকে বললাম—'দেখ্, বাবা আমায় পাঠিয়েছেন, পালাবি তো বাড়ি যেতে না যেতে মুখে বক্ত উঠে মরবি। আয় এদিকে, কিছু বলব না'।

"এল দাদা এক এক কবে। বললাম—'কিছু বলব না। বাবা এতদিন ছিলেন না, এবার ক'দিন হল এসেছেন মন্দিরে। যা ঘটি-বালতি-ঝাঁটা নিয়ে আয়, মন্দির পক্কের করতে হবে।'

"ভূতেরই দল তো দাদা, তাই না বাবা বরদাস্তও করেন অত, মিনিট কয়েকের মধ্যে একটা ঘড়া, দুটো বালতি, তিনটি ঘটি এসে উপস্থিত হল, তার সঙ্গে দু'গাছা ঝাঁটাও। মিনিট কয়েকের মধ্যে মন্দির সাফ একেবারে। দুটো কাছেই একটা বেলগাছে উঠে গিয়ে একগাদা বেলপাতাও তুলে নিয়ে এল। মন্ত্র জানি না, কেমন ভয় করল দাদা, ওদেরই বললাম, দে বাবার মাথায় ঢেলে। ওদের সাত খুন মাপ তো।

"তার পরদিন যখন ওখান দিয়ে যাচ্ছি তখন প্রায় সন্ধ্যে, ওরা

গোরু-ছাগল নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। গিয়ে দেখলাম, আজও পরিষ্কার করেছে মন্দিরটা, বিল্বপত্রও দিয়েছে, তার সঙ্গে দেখলাম কিছু আলোচালও ছড়ানো রয়েছে। হয়তো ওরাই দিয়েছে, কিংবা যদি বাবা ফিরে এসেছেন কথাটা চাবিয়ে দিয়ে থাকে, বড়দের মধ্যে কেউ বিল্বপত্র আলোচাল দিয়ে গিয়ে থাকে তো সে তো আরও ভালো। মনে একটা বেশ তৃপ্তি নিয়েই ফিরে এলাম দাদা, ভাবলাম, বাবার কপাল বুঝি ফিরল।

"কিন্তু কৈ ? সেণ্টারের গোড়াপত্তনের কাজ হয়ে যাওয়ায় আমি প্রায় মাসখানেক আর ওদিকে যাই নি, তার পর একদিন একটু দরকার পড়ায় ঐদিক দিয়ে দক্ষিণ পাড়ায় যাচ্ছি, খেয়াল হল মন্দিরটা একবার ঘুরে যাই। গিয়ে দেখি আবার সেই অবস্থা। অবশ্য ছেলেগুলো আর বোধ হয় ভেতরে গিয়ে উপদ্রব করে না, তারা দেখলাম একটা গাছতলাতেই খেলা ক'রছে, তবে মন্দিরের অবস্থা আবার সেইরকম ; নোংরা, লতাপাতা আর আগাছায় ভরে আসছে, আর এবাব দেখলাম একটি ষাঁড় দিব্যি আরাম ক'রে বাবার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে জাবর কেটে যাচ্ছে। আর ঠিক এই সময় যেন আমায় দেখাবার জন্যে ওপর থেকে একটা চুন সুরকির চাঁই খসে—পড়বি তো পড় একেবারে বাবার মাথায়। ষাঁড়টা আমায় দেখে ওঠে নি, দেখেছেন তো ওরা কাউকে কেয়ার করে না—চাঁইটা খসে পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল ; আমার মুখ দিয়েও কেমন যেন আপনিই বেরিয়ে গেল—'উঠলি কেন ?—বসে থাক্ না। টেনে টেনে বেড়িয়েছিস, এখন জো পেয়েছিস, দিব্যি আরাম করে বসে থাক।'

"বিশ্বাস করবেন না দাদা, কথাগুলো যেন আমায় ভূতের মতন পেয়ে বসল—'উঠলি কেন ?' ব'সে থাক্ না আরাম ক'রে।' দক্ষিণ

পাড়ায় একটা কাজে গিয়েছিলাম, সেখানেও ঐ, বাড়িতে এসেও ঐ, ভয় হল দাদা পাগলা গেঁজেলের পাল্লায় প'ড়ে আমিও পাগল হয়ে যাব নাকি !"

চা এল। গোবরা অন্যমনস্ক হয়ে আস্তে আস্তে শেষ ক'রে, কাপ ডিশ নামিয়ে রেখে বললে—"আচ্ছা দাদা, স্বপ্নে টপ্নে আপনার বিশ্বাস আছে ? মানেন ?"

বললাম—"স্বপ্নের রহস্যটা বড় জটিল গোবর। তবে মোটামুটি দেখা যায়, যে ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা যায়, সেইটাই অন্য একরূপ নিয়ে স্বপ্নে এসে উপস্থিত হয়। কেন, কিছু আদেশ-টাদেশ পেলে নাকি ?"

"রামঃ, তাহলেও তো বুঝতাম কিছু হুঁশ আছে বুড়োর। তা ভিন্ন সে সবের জন্যে তেমনি পুণ্যবল চাই তো দাদা। যাক, সে সব কথা পরে হবে, আপনাব সময়ও তো কম। সংক্ষেপে বলি—কথাগুলো যেন ঘুমেব মধ্যেও পড়ল ঢুকে—'উঠলি কেন ? ব'সে থাক্ না আরাম ক'রে'।

"এই সময় দিন চার পরে একবার বর্ধমানে যেতে হল ; ষাঁড়টা পড়ল চোখে·· "

"সেই ষাঁড় ?"

"আজ্ঞে না, সে ষাঁড় কি ক'রে হবে ?···ফিরে এলাম আমি। তারপরেই একদিন···"

গোবরা হঠাৎ চুপ করে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে রইল। গল্পটা জমিয়েছে, বেশ একটু কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম—"কি হল ? থেমে গেলে যে ?" বেশ একটু যেন কিরকম হয়ে গিয়েই গোবরা বলল—"বলতে কিরকম হচ্ছে দাদা। এই ধরুন

বেলা দশটা হবে, বাড়িতে বসে আছি, আমি, রাখাল আর গজা গল্প করছি, সেণ্টারের ছুটি ছেলে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত।… কি ব্যাপার ভাই, এরকম ক'রে যে অসময়ে?…না, এক ব্যাপার হয়েছে গোবরদা, মন্দির-তলায় একটা ষাঁড় এসে বসেছে।' বললাম— 'এ আর এমন কি ব্যাপার?'

'…না, কোন মতেই উঠতে চাইছে না যে!'…বললাম—'কারুর যখন ক্ষতি করছে না, থাকতে দাও না বসে।'…'না, সে সেরকম বসে থাকা নয়। আপনি একবার চলুন, না গেলে বুঝতে পারবেন না, চারিদিকের ক'টা গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। উঠুন শীগ্‌গির, দেখবেন।'

"গিয়ে দেখি সত্যিই যেন রথতলার ভিড়। সেণ্টারের ছেলেরা এর মধ্যে ভলাণ্টিয়ারিও আরম্ভ করে দিয়েছে, ভিড় সরিয়ে সরিয়ে আমায় নিয়ে গেল। দেখি, ষাঁড়টা ঠিক মন্দিরের মুখোমুখি হয়ে বসে রয়েছে চারপা গুটিয়ে—"

আমি প্রশ্ন করলাম—"সেই ষাঁড়টাই?"

গোবরা বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এবার আর মন্দিরের মধ্যে নয়, নীচে খানিক তফাতে, তবে ঐ যেমন বললাম, মুখোমুখি হয়ে। মুখের কাছেই চাল, ছোলা, মটর, কলা, শশা, রাশীকৃত একেবারে—বলতে নেই, আপনার দেখলে মনে হবে স্বপ্নটা যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আমি বললাম—'তা তোমরা এত তোয়াজে রাখলে উঠবে কেন বলো? ভিকিরী মহাদেবকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এরকম ভালো মন্দ জোটেও তো কম।'

'এই দেখুন তাহলে'—ব'লে দু তিনজন ভলাণ্টিয়ার হ্যাট্‌ হ্যাট্‌ ক'রে দুদিক থেকে বেশ জোরে নাড়া দিলে। কার উঠতে বয়ে গেছে?

ভিড়ের মধ্যে থেকেও প্রবল আপত্তি ক'রে উঠল, আমিও বারণ করলাম, ওরা ছেড়ে দিলে।"

গল্পটা যেন শেষ হয়ে গেল এইভাবেই চুপ করল এবার গোবরা। আমি প্রশ্ন করলাম—"তারপর ?"

বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবেই হেসে বলল—"এরপর একটু নিজের কথাই এসে পড়ে দাদা, সংক্ষেপেই বলি। মানে, খাটলাম একটু বাবার জন্যে। আহা, একেবারে অমন অবস্থায় পড়েছিলেন! তখুনি তখুনি আরম্ভ ক'রে দিলাম, অত লোক একসঙ্গে তো পাব না। একটু লেকচার যদি আর কি—'স্পষ্টই তো দেখছ বাবা আবার ফিরে এসেছেন, এখন আর যাওয়ারও ইচ্ছে নেই—তা তোমরা কি চাও ঐ অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে থাকবেন ?'···এইরকম আর কি।

"হৈ চৈ করে উঠল সব—'না না, চাঁদা তুলুন। গোড়া থেকে তুলুন মন্দির!···জয় বাবা বিশ্বনাথ! জয় বাবা তারকেশ্বর!'

"যেমন হয় আর কি। দিনকতক উঠে পড়ে লাগলাম দাদা, সেণ্টারের ছেলেরাও যা খাটুনিটা খাটলে! এখন গেলে আর চিনতেই পারা যাবে না সে জায়গা। নতুন মন্দির, তার সামনে দালান, চারিদিকে চওড়া চাতাল; নিত্যি পূজো আরতি। দুটো পূর্ণিমায় দুটো বড় মেলা হয়ে গেল বাবা ষণ্ডেশ্বরের! আপনি সবে এসেছেন, একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে, নিয়ে যাব আমি।"

বললাম—"নিশ্চয় যাব। কিছু কিছু কানেও গেছে, তবে তোমার মুখে সবটা শুনে বুঝতে পারলাম। কিন্তু একটা কথা তো বুঝতে পারছি না গোবর। এতবড় একটা ভাল কাজ করলে, এর মধ্যে অনুতাপ; পাপস্বীকার এসব এল কোথা থেকে ?"

বেশ খানিকক্ষণ হেঁট হয়ে চুপ করে বসে রইল গোবর, বাঁ হাতটা

মুঠো ক'রে ডান হাত দিয়ে খুঁটতে লাগল। তার পর একটু হাসি দিয়ে সেইভাবেই বলল—"উঠবে কি ক'রে ষাঁড়টা দাদা?"

বিস্মিতভাবে বুঝলাম—"বুঝলাম না তো। অত খাবার ছেড়ে বলছ!"

আর একটু চুপ করে রইল—তার পর মাথা তুলে বলল—"বর্ধমানে সেই যে ষাঁড়টার কথা বলছিলাম দাদা—দেখি সামনের পা দুটো ঠিক আছে, পেছনের পা দুটো যেন অকর্মণ্য, টেনে টেনে কোন রকমে চলছে! ষাঁড়ের কথা নিয়েই তো দিন কাটছে তখন, বড় কষ্ট হোল, জিগ্যেস করে জানতে পারলাম—বড্ড গুঁতুনে ষাঁড় ছিল, কয়েক জনকে জখম করে, তার পর ম্যুনিসিপ্যালিটি থেকে এই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। গেলাম ম্যুনিসিপ্যাল অফিসে দাদা। তারা বললে—ভেটিরিনারি আফিস থেকে করেছে, ম্যুনিসিপ্যালিটির কথায় গেলাম সেখানে।

"হাড় ভাঙাও নয়, অন্য কিছুও নয়, একটা ক'রে ইন্‌জেকশন দাদা। অনেকটা পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতন করে দেয়।"

জিজ্ঞেস করলাম—"একেবারে কায়েমী?"

ওরা বললে—"সেটা ডোজের ওপর নির্ভর করে।"

"চারজন শুধু জানি দাদা; আমি, গজা, রাখাল, আর জুয়েল ফার্মাসীর কম্পাউণ্ডারকে দলে টানতে হল, আমাদেরই বয়সী। ইন্‌জেকশনটা তো আমরা দিতে পারব না। বেশ রাত করে গেলাম আমরা, ইন্‌জেকশন আর দড়িদাড়া নিয়ে। জ্যোৎস্না রাত্তির।

"দুরন্ত নয় ষাঁড়টা—সেটা সেইদিনই টের পেয়েছিলাম। বেঁধে ছেদে মাটিতে ফেলে আমরা তিনজনে চেপে রইলাম, কেশব

ইন্‌জেকশনটা দিয়ে দিলে। আজ্ঞে হ্যাঁ, চারটে পায়েই বৈকি। না হলে ওরকম পা মুড়ে বসে থাকবে কেন?

"খুব ভালো করেই ডোজটা বুঝে নিয়েছিলাম দাদা, তবু এই প্রায় চারটে মাস যে কী মনোকষ্টে কেটেছিল, তারপর এই তিনদিন হল, আমরা বসে আছি মনমরা হয়ে। এদানিং এইভাবেই কাটতো তো, সেণ্টারের সেই দু'জন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত—'ভক্ত-ষাঁড' উঠেছেন, ঐ নাম পড়ে গিয়েছিল তো।

"এই কাহিনী দাদা, যত বলেন প্রবঞ্চনা হ'তে হয়, তারপর একটা জানোয়ারকে চারটে মাস জখম ক'রে রাখা—(না হয় রাজ-ভোগেই ছিল) তাও আবার খোদ বাবারই বাহন—তাই ভাবছি—বাবা কি এতটা পাপ বরদাস্ত করবেন? তাই মনে করলাম, দাদা এসেছেন, যাই তাঁর কাছে, ওদের মত ধরে কনফেশন করলে যদি…"

আমি হেসে বললাম—"পাপ-পুণ্যের রহস্যটা বড় কঠিন গোবর। তবে একটা কাজ বেশ সাহসের সঙ্গেই বলা যায়—তুমি যা কিছু করেছ তা স্বয়ং নীলকণ্ঠের জন্যে। যদি মনে করো কিছু গরল উঠেই থাকে এতে তো অমৃতও উঠেছে, গরলটা নিজের কণ্ঠে নিয়ে তিনি অমৃতটাই তোমার জন্যে রেখে দেবেন নিশ্চয়।"

স্বামী মদনানন্দ

অনেক ভেবে-চিন্তে হরঠাকরুন শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজী হলেন। গ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন, নাতি মদন ধরেছে নিয়ে যেতে হবে এবার।

দু'জন মাত্র নিয়ে সংসার হরঠাকরুনের, নিজে আর ঐ নাতিটি। নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে বছর এগারো হোল, বড় মেলায় নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক, কোথায় হারিয়ে যাবে। এযাবৎ কারুর বাড়িতেই রেখে যেতেন, কিন্তু গতবার তারকেশ্বর থেকে ফিরে এসে কিছু কিছু নালিশ শুনতে হোল। ছেলেটি যে খুব দুষ্টু এমন নয়, তবে বোধ হয় বুড়ি দিদিমার শিথিল হেফাজতে থেকে একটু বাউণ্ডুলে গোছের হয়ে গেছে। বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে চায় না, বল্গাহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে, নিজের খেয়ালখুশি মতো নূতন নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কোন কোনটা জটিলও হয়ে ওঠে। হরঠাকরুন নিজে যখন থাকেন—সামলে-সুমলে নেন, অপরের পক্ষে যেন দায় হয়ে ওঠে।

বললে আবার হয়তো রাখবে, দুটো দিনেরও ব্যাপার নয়, তবে হরঠাকরুন নিজেই যেন আর সেরকম নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। মদনের আবদারও এবারে বেশি, বলছে, "বড় হলে নিয়ে যাব, নিয়ে যাব করিস,—আর কত বড় হতে হবে তোর জন্যে তা বল।"

হরঠাকরুন বলছেন—"বুদ্ধিতে তো বড় হচ্ছ না, আমার পোড়া কপাল!"

মদন শাসাচ্ছে—"তুই রেখে যা এবার। ফিরে এসে দেখবি, কত বড় হয়েছি বুদ্ধিতে।"

হরঠাকরুন শর্ত করিয়ে নিলেন, বললেন—"তা তুই দেখাতে পারিস। গুণের তো ঘাট নেই। তা যাবি তো যেমন যেমন বলব ঠিক সেই রকম করবি। খবরদার! এবার ভারী যোগ, মস্ত বড় মেলা, একটু যদি এদিক-এদিক হয় তো কোথায় যে তলিয়ে যাবি, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছেলেধরা—তারা তো ওৎ পেতেই রয়েছে।"

"মেলা কখনও দেখিনি যেন!"

"তা তুই অনেক দেখেছিস, যা বাউণ্ডুলেপনা হয়েছে। তবে সে সব মেলা আর এ মেলা এক নয়, তাও বলে দিচ্ছি।—চল, দেখতেই পাবি।"

সত্যই, মেলা যে এবারে কী ভীষণ হবে, গোড়াতেই তার আঁচ পাওয়া গেল। তিনজনে বের হয়েছিলেন—নিবারণের পিসী, শঙ্করের মা আর হরঠাকরুন, মদন মিলে চারজন। তার মধ্যে ভীড়ের জন্য ওদের ছু'জনের সঙ্গে গাড়িতেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মদনকে সারাটা পথ বুকে জড়িয়ে রইলেন হরঠাকরুন, তারই মধ্যে একসময় তার কোঁচাটা খুলে কাপড়ের ঐ অংশ দিয়ে কোমরটা ভালো করে বেঁধে দিলেন এবং নামবার আগে নিজের আঁচলটাও কোমরে জড়িয়ে ছুটো কাপড়ের খুঁটে খুঁটে শক্ত ক'রে বেঁধে নিলেন। এত চাপ ভীড় যে গাড়ি থেকে নেমে নদী পর্যন্ত যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। ঘাট রয়েছে, তবে যা ভীড় আঘাটারও বিচার নেই, নদীর তীরের প্রায় পোখানেক নিয়ে নাইছে সবাই।

তবু ঘাটেই গিয়ে উঠলেন হরঠাকরুন ওরই মধ্যে খানিকটা নিরাপদ তো। যত নামা যায় জলের দিকে ততই ভীড়, ইচ্ছে ছিল মদনকে

নীচের একটা রাণায় যতটা সম্ভব সামনাসামনি বসিয়ে জলে নামবেন, কিন্তু এমনি চাপ ভীড় যে একটু চেষ্টা করে দুটো ধাপ নেমে আবার উঠে আসতে হোল। ওপরের দিকে সিঁড়ির পাশে কিছু কিছু যাত্রী বসেও আছে, তারই মধ্যে একটু জায়গা করে মদনকে বসিয়ে দিলেন হরঠাকরুন। পোঁটলা-পুটলি কিছু আনেন নি ; একটা শুকনো কাপড়, সিল্কের একটা নামাবলী আর একটা কমণ্ডলু ; নামাবলীটা কমণ্ডলুর মধ্যে পুরে কমণ্ডলুটা আর কাপড়টা ওর হাতে দিয়ে বললেন—"চুপটি করে বসে থাক, একেবারে নড়বি নি। আর দেরি হবে খানিকটে।"

পাশে যারা বসে আছে তাদেরও একটু নজর রাখতে বলে দিলেন। একজন বর্ষীয়সী বলল—"এখানে নিজেকেই সামলাতে পারা যাচ্ছে না; মা, কে কার ওপর নজর রাখবে বলো ? এ যা বিপজ্জয় মেলা এবার অত কচি ছেলেকে নিয়ে আশাই ভুল হয়েছে তোমার।"

একেবারে মুক্তিস্নান পর্যন্ত সেরে উঠে আসতে প্রায় ঘণ্টা দু'যেক লেগে গেল। খুবই ধুকপুকুনির মধ্যে কেটেছে। কয়েকবার হৈ-হৈ-ও উঠল, বড় বড় মেলায় একটু হুজুগ উঠলেই যেমন হয়। জপের মধ্যেই ঘাড় তুলে তুলে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয় ; প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা সিঁড়ি ভাঙো, তারপর কাদা, সেও অনেকটা পর্যন্ত, তারপর জল ; আর সমস্তটাই শুধু মাথা আর মাথা। পূর্ণমুক্তি হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আহ্নিকটুকু সেরে উঠে এলেন। এসে দেখলেন মদন নেই।

বুক চাপড়ে, কপাল চাপড়ে সমস্ত জায়গাটা ঘেঁটে বেড়ালেন হরঠাকরুন, সিঁড়ি, মন্দির, আরও খানিকটা এদিক ওদিক গিয়ে। শেষকালে গাঁয়ের মোড়লপাড়ার দুখীরামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

দুখারাম বললে, ভলান্টিয়ারদের আড্ডাগুলো আর পুলিশের মেলার থানাটা দেখতে হবে। নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

ভলান্টিয়ারদের আড্ডাগুলোয় পাওয়া গেল না। শেষকালে থানায় গিয়ে পাওয়া গেল বটে তবে সে এমন অবস্থায় যে মদন দেখতে পেয়ে যদি নিজেই না চেঁচিয়ে উঠত তো চেনাই দুষ্কর হয়ে উঠত। তাঁবুর বারান্দায় বসে আছে আরও কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে। কয়েকজন কান্নাকাটিও করছে, তবে মদন চুপচাপই, বেশ সপ্রতিভও। পাশের একটা ছোট মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছিল, হরঠাকরুনকে দেখে "দিদিমণি!" বলে চিৎকার করে উঠল।

পরণে নামাবলী, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধূলায় ধূসরিত, ঝেড়েছে, তবু এক পর্দা লেগেই রয়েছে এখনও। বোধ হয় কেঁদেছে খুব, চোখের চারিদিকটা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে আরও। পায়ের কাছে কমণ্ডলু রাখা রয়েছে, যে ছিটের কামিজটা পরেছিল, সেটা রয়েছে তার মধ্যে।

যথাপদ্ধতি পরিচয়াদি দিয়ে, ওদের খাতায় টিপসই দিয়ে নাতিকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন হরঠাকরুন।

এ অবস্থায় বাড়ি যাওয়া যায় না। ক্রোশ দেড়েক দূরে বোনঝির বাড়ি, ঠিক করলেন সেখানে গিয়েই উঠবেন আপাতত। মেলাটাও হালকা হোক, তারপর ওখান থেকেই গাড়ি ধ'রে চলে যাবেন।

মেলা থেকে কিছু কিনে নিতে যাচ্ছিলেন খাবার টাবার, মদন বলল—"তুই খাবি নাকি?"

"আমার জন্যেই যত মাথাব্যথা পড়ে গেছে, দেখছিস না। অত করে মানা করলাম—"

"তাহলে চল, আমার হয়ে গেছে ; সে গল্প শুনবি সব।"

"ঢের গল্প শোনা হয়েছে, আর শোনবার সাধ নেই।"—বেশ ব্যাজার হয়ে উঠেছেন হরঠাকরুন !

"সে শুনলে ছাড়তে চাইবি নি।"

কমণ্ডলুটা ওরই হাতে রয়েছে। কামিজটা বের করে নিয়ে হঠাৎ হরঠাকরুনের কানের দিকে তুলে নেড়ে দিল, খালি কমণ্ডলুটা ঝন-ঝন করে উঠল।

মেলা ছেড়ে ওরা দুজনে তখন মাঠে নেমেছে ; হরঠাকরুন থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"টাকা-পয়সা ! কোথায় পেলি ?"

কমণ্ডলুটা সরিয়ে নিল মদন, একটু মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল —"হুঁ হুঁ, তুই তো দুটো ডুব দিয়েই খালাস, আমি রোজগার করলাম কত !"

"রোজগার ! চুরি-চামারি করিসনি তো ?"

"চুরি করেছি ! চল তুই।"

গল্পটা আরম্ভ করল :

"তুই তো বসিয়ে রেখে চলে গেলি। বসেই আছি, বসেই আছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই সে-ই মন্দির পানে আচমকা একটা হৈ-চৈ, 'ষাঁড় ক্ষেপেছে, ষাঁড় ক্ষেপেছে।' সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা হৈ-চৈ 'ক্ষেপেনি, ক্ষেপেনি, ঠাণ্ডা হোল।' কিন্তু ইরিই মধ্যে যা পেষানটা হয়ে গেল দিদিমণি, মনে হোল গেলুম বুঝি সাবড়ে। সবাই উঠে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে, তার ওপর পেছন থেকে ভীড় পড়েছে চেপে, সাবড়েই গেছলাম, তবে 'ক্ষেপিনি, ক্ষেপেনিটা'ই তো বেশি হয়ে উঠল, তখুনি তখুনি আবার সামলে গেল। দেখলাম উরই মধ্যে

"এলি কি করে ওখানে ?"

বোধ হয় উৎসাহই আশা করে থাকবে, একটু মুখনাড়া দিয়েই বলল—"সেই কথাই তো বলছি, তা শুনবি তবে তো, নিজের কথাই পাঁচকাহন করছিস।—শুনছিলাম তো বসে বসে, যখন দেখলাম এক পয়সা এক পয়সা করে টাকা দুয়েক হয়েছে, ভাবলাম, যাক আর মেলা লোভ করতে নেই। মাঝে মধ্যিখানে যদি সিকিটা দু'আনিটা পড়ে থাকে—বালক সন্ন্যিসীর আবার বেশি তোয়াজ তো, তাহলে তো নেহাৎ মন্দও হোল না—ঐদিকে তোরও ওঠবার সময় হয়ে আসছে, খুঁজে পাবিনি তো ঠিক করলাম উঠে পড়ি এবার।

"ওঠাও তো শক্ত। বেশ বসেছিল বালক-সন্ন্যিসী, হঠাৎ উঠে চলল কোথায় রে বাবা ? ভাববে না লোকে ? কি করব মনে মনে ঠাহর করছি এমন সময় বললে বিশ্বাস করবিনি দিদিমণি, মা-গঙ্গা যেন মনের কথাটুকু বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাটুকু করে দিলেন।

"আবার সেই 'ষাঁড় ক্ষেপেছে ! ষাঁড় ক্ষেপেছে !' এবার একটু বেশি, আমার ইদিকটা পাতলা ভীড়ই ছিল তো, দেখতে দেখতে একেবারে চাপ বেঁধে উঠল। আমি কমণ্ডলুটা আবার কব্জড়িয়ে ধ'রে উঠে পড়লাম। এবার আবার দোলাটা তো বেশি, কখনও সামনে ঠেলে দিচ্ছে, কখনও পেছনে, কখনও পাশে ; এক একবার পা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে ভুঁই ছেড়ে ; এই করে করে যখন থামল, দেখি সামনেই পুলিশ-থানা, ধর্ একটা ঢিল ছুঁড়লে যদ্দূর যায়। বাহাদুরি নোব না দিদিমণি, প্রেথমটা ভয় পেয়েই গেলাম, পুলিশই তো। কি করব কি করব ভাবছি, এমন সময় দেখি সত্যিই একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এল, ছেলেটা হারিয়ে গেছে, আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে। নিয়েও আসছে জামাই-আদরে, বোঝাতে বোঝাতে, পিঠে হাত বুলিয়ে ; আর সে

পুলিশই নয়। মনে মনে বললাম ঠিক হয়েছে। কিন্তু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল দিদিমণি, অব্যেস তো নেই, তারপর হঠাৎ এক বুদ্ধি এল মাথায়। এবার 'ষাঁড় ক্ষেপেছে' শুনেই আমি কামিজ বের করে কমণ্ডলুতে গুঁজে নামাবলীটা মাথা থেকে নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছিলাম ; পরা নয় ; শুধু জড়িয়ে নিয়ে কষে গেরো দিয়ে নেওয়া, যাতে আবার না খ'সে পড়ে। সেটা খুলে কাপড়ের মতন করে প'রে নিলাম। তবু কি যায় ? তারপর একটা বুদ্ধি এল মাথায়—"

হরঠাকরুন একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন "মরি, কত বুদ্ধিই যে আসছে একটার পর একটা ! এসব কথা বলবি না গাঁয়ে কাউকে।"

"বলতে গেলাম অমনি ! আমার তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। —দেখলাম ছাইতো অমনি যাবে না, মুঠো কবে বালি তুলে নিয়ে চাপিয়ে দিলাম তার ওপর। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বুঝলি নে ? মনে করবে—"

"খুব বুঝেছি, তারপর ?"

"এদিকে তো এক রকম হোল, তখন আর এক সমিস্যে এসে হাজির।"

"আবার কি ?"

"বুঝলিনে ? হারিয়ে গেছি তা কান্না কই ?"

হরঠাকরুন ঘুরে চেয়ে বললেন—"ঐ তো ভিজে রয়েছে চোখের কোল।"

"তা তো রয়েছে, কিন্তু এলো কি করে তার কাহিনীটে শুনবি তো। অনেক চেষ্টা করলাম দিদিমণি। প্রথমে ভাবলাম- কাপড় হারিয়েছে, জামা ছিঁড়েছে—অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম, বয়ে গেছে

কান্নার আসতে। বুঝলিনে? যেমন লোকসান হয়েছে তেমনি পেয়েও গেছি তো আধ কমণ্ডলু ভরে, আসবে কেন কান্না? তারপর বাবা মা'র মরে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলাম—নাঃ, কতো ঢোক গিলছি, কত বুক চেপে ধরছি, কোথায় কান্না? সেই কবে মরে ভূত হয়ে গেছে তো দুজনে? তারপর একটা বুদ্ধি যুগিয়ে গেল দিদিমণি, কষে মনে করলাম তোকে যেন মা-গঙ্গা কেড়ে নিয়েছে, ডুব দিয়েছিস, তারপর আর—"

হরঠাকরুন দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—"ছ্যাখো! ছ্যাখো? দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছি! দিদিমণিকে মা গঙ্গা নিলে জ্বালাবি কাকে র‍্যা ড্যাকরা? সব তো খেয়ে-দেয়ে বসে আছিস।"

মাথার ওপর রোদ চনচন করছে, ঘুরে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

মদন বলল, "এত সব উল্টো বুঝিস তুই! কান্নাটা তো আনাতে হবে কোন রকমে? অবিশ্বাস করবিনি দিদিমণি, কান্না এল, সে যেন ডেকে বান ঢুকল গাঙে—'দিদিমা গো, কোথায় গেলি গো আমায় ছেড়ে!' একেবারে গলা তুলে দিলাম আকাশে। কতক্ষণই বা? একেবারে থানার সামনেই তো, সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ভীড় ঠেলে এসে হাজির।—'কি হয়েছে খোকা?'

মদন একবার চোখ তুলে আড়ে চেয়ে নিল হরঠাকরুনের দিকে, বলল—"আমি বললাম নেয়ে-টেয়ে দিব্যি পুণ্যি করে আসছিল আমায় শক্ত করে ধরে ধরে, ভীড়ের চাপে হাত ছেড়ে ছিটকে পড়েছি। আমার দিদিমণিকে এনে দাও—দিদিমণি না হলে আমি বাঁচব না—দিদিমণিকে বড্ড ভালবাসি আমি—দিদিমণিকে না পেলে আমি গঙ্গায়—"

"হয়েছে, হয়েছে, থাম। উনি ঐসব বললেন! বড় নাকি টান দিদিমণির ওপর!"

হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উদ্‌গত অশ্রু মুছে নিলেন হরঠাকরুন। বললেন—"গাঁয়ে এসে পড়িছি, চুপ কর। মরি কি-ছিরিই যে হয়েছে। বলবিনি কাউকে এসব কথা, খবরদার!"

মদন বলল,—"গেলাম বলতে অমনি! খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই আমার।"